

প্রথম প্রকাশ

নববর্ষ ১৩৬৭

প্রকাশিকা

অরুণা বাগচী

অরুণা প্রকাশনী

৭ যুগলকিশোর দাস লেন

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট

পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক

পরেশনাথ পান

ইন্দ্রলেখা প্রেস

১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা ৬

লেখকের অন্য গ্রন্থ :

এই মৈত্রী। এই মনান্তর।

বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি

## সূচি

মুখবন্ধ

# 'রচনাবলির সমগ্রতা'

প্রত্যেক কবির বিচারেই তাঁর সমগ্র রচনা এবং সেই রচনার কালানুক্রম সম্পর্কে জ্ঞান খুব কাজে লাগে। কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান প্রায় অপরিহার্য। বিষ্ণু দে, আমাদের মতে, সেরকমই একজন কবি। অথচ বিষ্ণু দে-র রচনার সমগ্রতা ও কালানুক্রম বিষয়ে বহু পাঠকই অজ্ঞ বা উদাসীন। বিষ্ণু দে দীর্ঘদিন লিখেছেন এবং প্রায় ছেদহীনভাবে লিখেছেন—তাঁর ঐ অবাধ সৃজনীশক্তির কারণেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে চিঠিতে উচ্ছ্বসিতভাবে জানান, 'আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়।'[১] এবং শুধু তাই নয়, একথাও হয়তো বলা যায়, তিনি অনেক লিখেছেন (এক্ষেত্রে অবশ্য, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের তুলনা ওঠে না)। তাঁর বহুপ্রজ রচনায় আছে অনেক বাঁক, নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি—প্রসঙ্গ ও প্রকরণের প্রগতি। আর সে-বিষয়ে অজ্ঞতা থাকলে যা হয়, তা হল তাঁর প্রথম দিককার কোনো কবিতাকে খ্যাতির কারণে মনে করা হয় তাঁর পরিণত প্রকরণের প্রতিনিধিমূলক উদাহরণ—যদিও হয়তো কবিতার সংখ্যা বা স্বভাব কোনো দিক থেকেই তার সমর্থন নেই। কবির প্রথম দিককার কোনো কবিতা কোনো পাঠকের কাছে সংগতভাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধির উদাহরণ বলে মনে হতেই পারে (যেমন ধরা যাক, 'ঘোড়সওয়ার')—কিন্তু তখনও, কবিজীবনে তার স্থান কোথায় এবং তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টিতে তা প্রতিনিধিমূলক কিনা, এই বিস্মরণ অমার্জনীয়।

এটা বেশি বিপত্তিকর হয় বিষ্ণু দে-র কাব্যবিকাশের প্রথম পর্যায়ের কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের আলোচনায়। কাব্যবিকাশের চূড়োয় পৌঁছবার আগেই যে-পরিক্রমা চলে, সেই পরিক্রমার পর্বে পর্বে প্রায়শই নিপুণ ও সার্থক কবিতাও বেরোতে পারে তাঁর হাত দিয়ে (যে-কথা অনেকেরই মনে হয়েছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'-র কোনো কোনো কবিতা পাঠ করে), কিন্তু তাকে কখনই তাঁর কাব্যস্বরূপের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা চলে না।

এর ফলে যা হয়, শুধু একটি কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, কোনো এক যুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দে-র সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গেঁথে যায় বিষ্ণু দে-র নিরন্তর প্রবহমানতার কালানুক্রম বিষয়ে অজ্ঞ পাঠকের মনে। আর সেই ভ্রান্তিতে মনে হয়, বিষ্ণু দে কাব্যপ্রকরণে এলিয়টের অনুসারী—যদিও সেটা তাঁর কাব্যবিকাশেব প্রথম পর্যায়ে কিছুটা বলা গেলেও, পরবর্তী পর্যায়ে, তাঁর কাব্যজীবনের দীর্ঘতম সময়ে, মোটেই সত্যি নয়। অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের প্রাকরণিক অভিজ্ঞতাকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন, কাজেও লাগিয়েছেন হয়তো পরে—কিন্তু তার চেয়েও সত্যি, তিনি অনেকদিন ছেড়ে এসেছেন এলিয়টী প্রকরণের সংস্পর্শ। ঠিক সে-রকমই প্রথম পর্যায়ের পরেই তাঁর কবিতায় শব্দগত বা পুরাণ-উল্লেখগত পড়াশোনাজাত দুরূহতা যদিও অনেক কমে যায়, ক্রমশই কমতে থাকে, কখনো শব্দ ও উল্লেখের সারল্য প্রায় হয়ে ওঠে বিস্ময়কর, তবু অমনোযোগী পাঠকের পূর্বস্মৃতি অনড়। দুরূহতার অপখ্যাতি রয়েই যায়।

কালানুক্রম বিষয়ে শুধু তথ্যজ্ঞান থাকলেই অবশ্য কাজ শেষ হয় না। বিষ্ণু দে-র প্রবহমান বৈচিত্র্য, অথচ সেই সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা, রবীন্দ্রনাথের মতোই, তাঁর প্রকরণে এমন-একটা বৈশিষ্ট্য দেয়, যার স্বাদ পূর্বযুগের প্রকরণের আলোয় আরো স্পষ্ট হয়। এক পর্বের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কখনো পরম্পরায় কখনো বৈপরীত্যে তিনি পর্বান্তরে চলেন। ফলে, আরো একটা বড ক্ষতি বিষ্ণু দে-ব হঠাৎ-পাঠকদের —তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয় না কোন শব্দ, কোন বাক্‌প্রতিমা, কোন উল্লেখ শব্দ-বাক্‌প্রতিমা-উল্লেখের অরণ্য থেকে উঠে এসে কীভাবে তাঁর সামগ্রিক কাব্য-অভিজ্ঞতায় আত্ম-উন্মোচনের কাজ করছে, তাঁর কবিতার চাবিকাঠির কাজ করছে। বুঝে উঠতে পারবেন না তাঁরা 'বীজকল্প' শব্দের তাৎপর্য কিংবা দীর্ঘ ব্যবহারের সুবিধায় কেন 'কপিলগুহা' শব্দটির একবার উল্লেখেই অন্য এক পাঠকের হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে যায়। অথচ প্রথম জীবনের মুখ্য ও গৌণ অজস্র পুরাণ-উল্লেখ থেকে এভাবেই তো গড়ে ওঠে তাঁর কবিতায় কৈলাসবাসী হরগৌরী বা সতী-পার্বতী বা কুমারসম্ভবের ইঙ্গিতময় প্রতীক। শুধু তাই নয়, এক-একটি পর্বের উপমা-উল্লেখের পুনরাবৃত্তিতে ও পুনর্গঠনে তৈরি হয় স্থায়ী এক-একটি পৌরাণিক কাঠামো। এভাবেই বৃষ্টি-নদী-সাগরের প্রাকৃত উপমায় মেলান তিনি ভাগীরথী ও সগরসন্তানমুক্তির পুরাণকে। নগ্নতনু সৌন্দর্যের প্রতীক আর্টেমিস কিংবা অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাতা কবিমানসী মিলে যায় প্রতীক্ষারতা মহাশ্বেতায়—কিংবা আরো পরে আমাদের জীবিকার লড়াইয়ে সহকর্মিণী সঙ্গিনী জঙ্গী নারীতে।

'চোরাবালি'-র নানার্থব্যঞ্জক প্রতীক ঘোড়সওয়ার লোকায়ত অবয়ব পায় লালকমল-নীলকমলে, সামাজিক-রাজনৈতিক অবয়ব তেভাগা আন্দোলনের কৃষাণ-কৃষাণীতে। এইভাবে পারম্পরিক সংলগ্নতায় ও বিকাশে পৌরাণিক উল্লেখগুলি বাস্তব-জীবনে যে তাৎপর্য পায় তাই নয়,জটিল শব্দ বা শব্দবন্ধের পাঠও পুনরাবৃত্তির গুণে অনায়াস হয়ে যায়, কবির নিজস্ব শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠতে থাকে। কবির বাক্যগঠনের ধরনও হতে থাকে পাঠকের পরিচিত। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, প্রথম জীবনে শব্দ উপমা প্রতিমা বা উল্লেখে তথাকথিত পাণ্ডিত্যের যে কিছুটা উগ্র প্রকাশ দেখা যায়, তার কোনো নান্দনিক ও ঐতিহাসিক যাথার্থ্যকে আমরা অস্বীকার করছি। সুধীন্দ্রনাথ যাকে 'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি' বলেছেন—স্বকীয়তা প্রকাশে মিথ্যা অহংকার নয়, আত্মম্ভরী প্রগল্‌ভতা নয়, সত্যভাষণের নিরহংকার একাগ্রতা এবং পূর্বসূরীদের আশ্রয়পুটে প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা ও বক্রতা—এ সমস্তই ছিল রবীন্দ্রোত্তর কবিতার জন্মকালীন দায়। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা আবারও ব্যবহার করে বলা যায়, সভ্যতার প্রাথমিক সরলতা আজ আর সম্ভব নয়, আজকের জটিল ও কুটিল জীবনে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ করেই কাব্য-কল্পতরুর জন্ম দিতে হয়।[২]

কিন্তু, মানতেই হবে, বিষ্ণু দে যদি সেখানেই থেমে থাকতেন, যদি ঐ পাণ্ডিত্য কবি-ব্যক্তিত্বের বিকাশের একটি প্রাথমিক, চমকপ্রদ কিন্তু প্রাণময় স্তরের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই না থেকে স্থায়ী সুর হতে চাইত, তবে সেই পাণ্ডিত্যের কূট ভেদ করার শ্রম হত পণ্ডশ্রম। অবশ্য, কিছু কিছু কবিতার আতিশয্য বাদ দিলে, সে-পর্বেও কূট ভেদের অত্যুৎসাহ ততখানি আবশ্যক কিনা এটাও সন্দেহ—যদি না অবশ্য সেই পাঠককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তর দিতে হয়। প্রকরণের কূটজালে আবৃত প্রথম পর্যায়ের কোনো কোনো কবিতা বিষয়ে সতর্ক পাঠকদের অস্বস্তি ততখানিই সত্য, যতখানি সত্য এই মেঘাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ক্ষণ পার হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সাবলীলতার জগতে পাঠকের সহজ নিঃশ্বাস। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণু দে-র সমগ্র কাব্যসম্ভারকে সামনে রেখে এই কালজ্ঞান অনেকেই দেখাতে পারেন না। তাঁর কাব্যের দুর্বোধ্যতা নিয়ে কিংবদন্তির পরমায়ু বড় দীর্ঘ, তার আড়ালে প্রত্যক্ষও লুকিয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু এ সমস্তই তো বাইরের বাধা। এই ভ্রান্তিগুলো যে পাঠক উত্তীর্ণ হবেন, তিনি কি আর কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না বিষ্ণু দে-র কবিতার ক্ষেত্রে? কবিতার ভেতরকার বাধা? সেটাই তো আসল বাধা, বড় বাধা।

বিষ্ণু দে প্রথমাবধিই নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণের কথা ভেবেছিলেন। তাই অনুশীলনী পর্বে আর কেউ নয়, প্রমথ চৌধুরীই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে অনুকরণীয় মনে হয়েছিল—ট্রিয়োলেটগুচ্ছ বা এমন কি গল্প রচনাতেও। পরে, আরেকটু সিরিয়স পর্বে, বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্য বা পুরাণ থেকে অজস্র উল্লেখ, এমন কি বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন পরোক্ষতায়। 'চোরাবালি'তে এসে অনেক কবিতাতেই দেখতে পাই কী ভাবে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিককে মেলাচ্ছেন তিনি কবিতায় একাধিক মাত্রার সম্পাতে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়, ব্যক্তিগত অনুভূতির গোষ্পদে বিশ্বমানবিক ছায়া।[১]

ক্রমশ কী ভাবে সেই মাত্রা বেড়ে যায়, রূপান্তর ঘটে তার সামাজিক-রাজনৈতিক অন্বয়ে. শব্দভাণ্ডারেরও বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটে—তা-ই তো বিষ্ণু দে-র কাব্যধারার ইতিহাস। ফলে, যে পাঠক একটি মাত্রা খুঁজবেন, তিনি শব্দপ্রয়োগের অসরল উচ্চাবচতায় অস্বস্তি বোধ করবেন। নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাপ এখানেও আছে, পাঠক নিশ্চয়ই তাতে সাময়িক সাযুজ্যও বোধ করেন—কিন্তু অচিরেই অর্থান্তরের ছোঁয়া তাঁকে বিচলিত করে—শব্দপ্রয়োগের আকস্মিকতা বা দূরত্ব তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একই কবিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেই শুধু নয়, একই শব্দে একাধিক মাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে পাঠককে। একটি প্রতিমা কখনো ব্যক্তিগত উত্তাপ বিকীরণ করে, কখনো উদ্ভাসিত হয় ইতিহাসের সাঙ্গীকরণে—লুকোচুরি চলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার। কবিতার একটি অর্থকে গ্রহণ করে যে পাঠক স্বচ্ছন্দে এগোতে চায়, অকস্মাৎ বাঁধা সড়ক থেকে প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়ে—কবিতার মোচড়ে আভাসিত হয়ে ওঠে ভিন্ন মাত্রার ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা।

'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির শেষাংশটুকুই ধরা যাক। প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে অংশটির শুরু: 'গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝর্ণা।' মোটামুটি কোনো অসুবিধে হয় না পাঠকের। কিন্তু খানিক পরেই অভাবিত সব শব্দ আসতে থাকে: 'তবুও নিথর পাখির ঝাঁকে জলের বাঁকে' লাইনটি থেকে। তখনই বোঝা যায় আগের প্রাকৃতিক বর্ণনা যতটা নিরীহ মনে হয়েছিল, ততটা তা নয়। নিছক প্রকৃতিপ্রেমের মুগ্ধতায় কবিতাটি হজম করা শক্ত। কিংবা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' বইয়ের সেই বিখ্যাত 'ক্লান্তি নেই' কবিতাটি?

চাই না তুমি বিনা শান্তিও,
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই।
কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার ?
আমারই হৃদয়েব কান্তি ও।

কবিতাটিকে কেউ কেউ নিছক প্রেমের কাবতা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার আগের স্তবকেব বহু শব্দই তাঁদেব অস্বস্তিতে ফেলে—'জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়' ইত্যাদি অংশে। ঐ অস্বস্তি তখনই ঘুচবে, যখন পাঠক এ-বিষয়ে সজাগ হবেন যে 'তুমি', 'শান্তি', 'আকাঙ্ক্ষা' কোনো শব্দেই আর এখানে একটি জিনিস বোঝায় না।[৪]

ফলে যে বহুমাত্রার বিন্যাস কবিব নন্দনের অন্বিষ্ট, তার শরিক হতে হয় পাঠককেও। কবিতাকে বা সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকেই চিনে নিতে হয় শুধু কবিতা থেকে নয়, তাব সংলগ্ন কবির অন্যান্য বচনা ও এমনকি সামাজিক-রাজনৈতিক বা সাহিত্যগত কাজকর্মেব পরিচয়েও। পল্‌কা, দুর্বল, অতিসবল শিল্পবিলাসী কাব্যবোধে এই জটিল বহুমাত্রাব কবিতা একটা উঁচু পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ তো এই, বিষ্ণু দে-র কবিতার বিচরণভূমি বিরাট, বিস্ময়করভাবে বিরাট। অনেক ভুবন তিনি হেঁটে বেড়ান, কিংবা হয়তো সে একই বিরাট ভুবন। নিছক বিষয়ের বা উপকরণের দিক থেকে, উপমা বা উল্লেখ বা বাক্‌প্রতিমার উৎসস্থলের দিক থেকে, অনুভূতির ও কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন তল বা পর্দার দিক থেকে.তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এ বুঝি শুধু বৈচিত্র্যই নয়, একই প্রেরণার ঐশ্বর্যরঙিন প্রকাশ। সেই ঐশ্বর্যেই ঝলমল করে তাঁর কবিতার জগৎ। বিভিন্ন বিদ্যা বা জ্ঞানেব আশ্রয় তিনি নেন, সেই কৈশোর থেকেই, যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন 'আমাদের ভালোবাসা রিফ্লেক্স্ লিলি', এই ব্যঙ্গোক্তির প্রকাশে সাইকোলজিব আঁকাড়া শব্দপ্রয়োগের জন্য।[৫] অবশ্য অভ্যাসের এমনই গুণ যে, এখন আর প্রবলতম বিষ্ণু দে-বিরোধীও বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত এ-প্রসঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না।

সুতরাং বিষ্ণু দে-র কবিতার জগতের এই ব্যাপ্তি এবং জটিলতাই একটা বড় বাধা। সময়ের তালে তালে যদিচ সময়ের সঙ্গে অসরল সম্পর্কে চলে বলে এই কাব্যধারাকে যেমন কালানুক্রমিকভাবে জানতে হয়, তেমনি কবি যত কিছু বিষয়কে

ও উপাদানকে গ্রহণ করেন, প্রথম জীবনের বৈদগ্ধ্য-প্রদর্শনের উগ্রতায় নয়, ক্রমশ কাব্য-অভিজ্ঞতার লক্ষ্যের একাগ্রতায় ও বাক্‌প্রতিমার অন্তর্নিহিত গরজে, সেই অনিবার্যতাকে গ্রহণ করার নিরলস ক্ষিপ্রতাই চাই পাঠকদের কাছ থেকেও। বিষয় ও উপাদানের এই ব্যাপকতাকে নিছক পাণ্ডিত্য বলে মনে করলে ভুল হবে তখন, এ পরিগ্রহণ তো তাঁর নন্দনচেতনারই অন্তর্গত। সাম্য-বাদীর জগৎকল্পনার বৃহৎ স্বপ্ন ও দৈনন্দিন রাজনীতির সরলীকৃত প্রয়োজনসাপেক্ষ কর্মকৌশল যেমন এক নয়—তেমনি সর্বজনবোধ্য লোক-কবিতা বা গণ-কবি আর এমনকি মার্কসবাদীর আধুনিক কবিতা, এ দুয়ের লক্ষ্য কখনই এক বলে তিনি মনে করেন নি।

এ তো গেল বিষয় বা উপাদানের দিক থেকে এই ব্যাপ্তি। মেজাজের ওঠানামাও কম দিশেহারা করে না পাঠককে। কখনো বাক্‌বাহুল্যে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দেন, কখনো চলে যান প্রায় স্বল্পবাক্‌ নিঃশব্দের কবিতার ধার ঘেঁসে। কখনো যুক্তির গাম্ভীর্যে তিনি স্তব্ধ পিরামিড তৈরি করেন, আবার কখনো লিরিক স্বচ্ছতায় পাঠককে চঞ্চল করে তোলেন। নদীতে কখনো শান্ত স্রোত, কখনো আকস্মিক ঘূর্ণি। অনুভূতির এই বৈচিত্র্য, কখনো চড়া পর্দা, কখনো খাদ, কখনো শুদ্ধ স্বর কখনো বা কোমল—তার ঝোঁকে শব্দেও মোচড় পড়ে—অপ্রত্যাশিত, অনভ্যস্ত টান আসে।

কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে? তাঁর পরিণত রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ওঠানামা—শব্দের এই অর্কেস্ট্রা বা ভাস্কর্য। 'অন্বিষ্ট' বা 'জল দাও'র মতো যে-কোনো একটি দীর্ঘ কবিতার অনুসরণেই বোঝা যায় মেজাজের এই বৈচিত্র্য।

'জল দাও' কবিতাটির শুরু মোটামুটি নৈমিত্তিক একটা এলানো ভঙ্গিতে:

ফাল্গুন আরম্ভে তার—
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই,
কিম্বা তারও আগে,
ও বছরে - বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোট ঘেরা মাটির সংযমে

এই ছেড়ে-বলার ভঙ্গিটি শিগ্‌গিরিই কাটিয়ে কবির গলায় আবেগের দ্রুততা আসে:

তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্‌
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরো থরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল'।
তার পরই সেই আবেগ গড়িয়ে যায় ধীর স্তব্ধ উপলব্ধিতে :
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।
কখনো বেদনায় তিক্ততায় টেনে টেনে বলেন :
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছ'ং'য় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দা শানের শয্যায়—
কী যে ভাবে ঘব ছেড়ে খোঁজে বুঝি কো
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় না • সে ঢাকায়···
কিংবা কখনো তত্ত্বের গাম্ভীর্য :
হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা.বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
কিংবা
আমাদেরই ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে।
তাব পর অকস্মাৎ 'সতর্ক গম্ভীর' স্তব্ধ-প্রতীক্ষা ভেঙে পড়ে জলস্রোতের দোলায় :
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্‌ ছডাবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো ··
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর –

করে নিচ্ছেন কবি এ-যুগেই।

অর্থাৎ জমি তৈরি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্ত চাপটাই বাইরের দিক থেকে। বাইরের ধাক্কায় কবিব্যক্তিত্বের ঢালাই-পেটাই-গড়াই চলেছে মাত্র। কিন্তু এ-পর্যন্ত কবির বিশ্বাসের জগতে মোটামুটি যে স্বচ্ছন্দ ধারাবাহিকতা চলছিল, তা প্রথম ধাক্কা খেল সাম্যবাদী রাজনীতির ইতিহাসের এক বিভ্রান্তিকর অধ্যায়ে। কবির বিশ্বাসের জগৎ সমানই অটুট, অথচ তিনি বিচ্ছিন্ন সহযাত্রী-দের কাছ থেকে। ঠিক এ-রকম ঐতিহাসিক মুহূর্তেই, ভেতরে ভেতরে যখন তিনি প্রবল নাড়া খেয়েছেন, তখনই ঘটল সেই রসায়ন—শব্দের আত্মসচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রস্তুতির অতীত এমন-একটি ঘটনা, যখন সব উপার্জন সংশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে একেবারে ভেতর থেকে, তার পর বাইরে এসে বিশ্লিষ্ট হয় যেন রামধনুর সাতরঙের বিচ্ছুরণ। বিশ্বাস ও আবেগকে চূর্ণ করে প্রিজমের মধ্য দিয়ে বর্ণভঙ্গ ঘটিয়ে তিনি যেন প্রত্যেকটি রঙকে বুঝে নিতে চান। তাই কি 'রামধনু' শব্দটি তাঁর এত প্রিয় এই গ্রন্থে, এবং পরেও?

এইভাবে বেরিয়ে এল স্বতন্ত্র এক ভাষা, কবির নিজস্ব উচ্চারণ। 'অন্বিষ্ট'-তেই আমরা প্রথম পেলাম কবির উপলব্ধির সম্পূর্ণ জগৎ। তাঁর কাব্যচেতনা ও প্রকরণসিদ্ধির উদাহরণ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বর। সেই স্বরের জন্য প্রযোজনীয় নতুন উচ্চারণ।

বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে, পর্ব-পর্বান্তরের প্রকরণগত নানান চমক সত্ত্বেও, এই প্রাপ্তি বা উপার্জন যেন খানিকটা, অসংলগ্ন নয় বলেই, অনায়াস। এই প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কথা। কিন্তু এই বিকাশের আনুপর্বিক সঙ্গী যে পাঠক হন নি, তাঁর আকস্মিক পঠনে অভ্যাস প্রায়শই আহত হয়। ভাষার এই বিকাশলব্ধ, কিন্তু সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত উচ্চারণে অপ্রস্তুত বাঙালি পাঠক তাই দিশেহারা। বিষ্ণু দে-র ভাষার এই নবীনতার কারণেই মাইকেলের দৃষ্টান্ত মনে এসেছে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-র।[৬] এক-অর্থে ঠিকই। মাইকেলের কাব্যভাষাব—প্রবাহমান অমিত্রাক্ষরের—প্রায় বৈপ্লবিক নতুনত্বের কারণেই উচ্চারণ কবতে পারেন নি তৎকালীন পয়ারে অভ্যস্ত পাঠকেরা - এমন-কি বিদ্যাসাগর, যিনি গদ্যে ছন্দের সুষমা এনেছিলেন। তাই ক্ষুব্ধ মাইকেলকে বলতে হয়েছিল: **My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.** বিষ্ণু দে-র এই নতুন কবিতার পাঠও ভিন্ন। তবু এ পাঠ নতুন কবিতারই

পাঠ। তারই প্রয়োজনে এর জন্ম। এ কথা বলে নেওয়া ভালো, কারণ বিপত্তিটা ঘটিয়েছেন বোধ হয় বিষ্ণু দে নিজেই। রেকর্ডে তাঁর 'ঘোড়সওয়ার' পাঠের কথা বলছি। আগের যুগের কবিতাকে নতুন যুগের উচ্চারণে পড়লে যে জোর খাটানো হয়, উচ্চারণে কালানৌচিত্যের দোষ ঘটে, তা প্রমাণ করেছেন বিষ্ণু দে নিজেই, 'ঘোড়সওয়ার'-এর অতিপ্রত্যক্ষ নাটকীয়তাকে 'অন্বিষ্ট'-যুগের কথোপকথনের ক্যাজুয়াল উচ্চারণে পাঠ করে। ঠিক যেমন 'অন্বিষ্ট'-র উচ্চারণে শিখিয়েছেন এই নতুন স্বরক্ষেপের মধ্যেই আছে তাঁর নতুন কাব্যভাষার রহস্য।

তাঁর কবিতায় প্রসঙ্গের ঐশ্বর্য যখন জাঁকালো ও নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, অথচ বাইরের আঘাতে দীর্ণ হয়ে ভাষার অন্তর্মুখী প্রত্যয়-বিচ্ছুরণ নতুন নতুন মাত্রা পেতে শুরু করেছে, তখনই তো বাক্যস্রোতে এসেছে ঘন ঘন বিরতি বা বাঁকবদল। ঠিক দ্বিধা নয়, সাবলীলতার উচ্ছ্বাসে অবিশ্বাসী আত্মসচেতন জটিল মনের সততা, আহত সততা। স্বগতভাষণ বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সংলাপের স্বাভাবিক মন্থর অন্তরঙ্গ সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ বাক্যের একটা আপাতশিথিল কাঠামো।

অর্থাৎ এ-ভাষার সঙ্গে মানুষের কথা বলার ধরনের সাদৃশ্য আছে—হয়তো বিশ্লেষণ করলে পুরনো কলকাতার, কিংবা বাংলাদেশেরই কিছুটা সাবেকি বাক্‌রীতির মৌল রূপের প্রভাবও আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু তা বলে বিষ্ণু দে কখনই মুখনিঃসৃত অসংবদ্ধ অসচেতন বাক্যকে আশ্রয় করেন নি। অর্থাৎ দৈনন্দিন মানুষ যে কথা বলে, তার একটা রূপ আছে—যা খানিকটা সাময়িক, চরিত্রহীন, সহজেই ফ্যাশনের দ্বারা প্রভাবিত, খানিকটা পিছল ও ফিচেল। কিন্তু দৈনন্দিন বাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত একটা আলাদা চারিত্রও আছে, আছে তার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ শক্তি ও স্বাস্থ্য। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ বহুলাংশে এই দৈনন্দিন বাক্‌রীতির সঙ্গেই যুক্ত। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্নটা এভাবে ওঠেই নি। তিনি তথাকথিত গদ্যছন্দের অস্পষ্টতা বা অনির্দিষ্টতার প্রবল বিরোধী। আবার অন্য দিকে তথাকথিত পদ্যছন্দের সুরেলা ব্যাপারকেও খারিজ করেন। তাঁর কাছে এটা কোনো আলাদা সমস্যাই নয়। যে কবিব্যক্তিত্বে তিনি বিশ্বদৃষ্টির সমগ্রতাকে কবিতায় আনতে চান ভারমুক্ত সহজ কৌতুকে, সেই ব্যক্তিত্বেরই স্বাভাবিক নির্বাচনে বন্ধনের মধ্যেই তিনি আনেন মুক্তি, ছন্দকাঠামোর মধ্যে দৈনন্দিন বাক্‌স্পন্দ। ছন্দের লয় মেনেও কোথায়

যেন এসে যাচ্ছে সহজ বাক্‌ভঙ্গি-উৎসারিত গদ্যোচ্চারণের একটা ঝোঁক। অথচ সেই ঝোঁকটাই আবার অসামান্যভাবে, যেন অন্য এক স্তরে, মেনে নিচ্ছে ছন্দের শৃঙ্খলা। ফলে ছন্দে বা উচ্চারণে তৈরি হচ্ছে একটা বিপরীতের সমন্বয়। ছন্দকাঠামো ও গদ্যস্পন্দের একটা অদ্ভুত টানাপোড়েন। এই সমন্বয় ও টেনশন তো তাঁর কাব্যভাষার আলগা বৈশিষ্ট্যই নয়, এর উৎস তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতাতেই। তাঁর কবিতায় যেমন গতির ও স্থিতির, কঠিন ও তরলের সিমফনি তৈরি হয়, তেমনি তারই প্রয়োজনে তাঁর ছন্দেও আসে বাক্‌স্পন্দের এই উচ্চাবচ ভাস্কর্য।

কিভাবে তৈরি করেন তিনি এই ভাস্কর্যের খাঁজ, আলোছায়ার খেলা? কখনো মাত্রাসমাবেশের চলিত রীতি ভেঙে টলিয়ে দেন সুরেলা উচ্চারণের আবেশকে। কখনো লঘু ও গুরুর যুক্তাক্ষর ও স্বরবর্ণের স্বাধীন বিন্যাসে ধাক্কা দেন। কিংবা কম্পন আনেন আকস্মিক অনুপ্রাসের কৌতুকে। কখনো-বা শব্দনির্বাচনের কৌশলে শব্দার্থের স্বতন্ত্র মর্যাদাতেই দাবি করেন উচ্চারণের স্বতন্ত্র মনোযোগের ধরন। প্রত্যেকটি শব্দ তখন আলগা আলগা পৃথকভাবে উচ্চারিত হতে চায়। একই বাক্য বা বাক্যাংশে বা স্তবকে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় সাজিয়ে দেন। সব মিলিয়ে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন স্বরের, বা হয়তো স্বর ও স্বরভাঙার একটা শব্দজাল। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক আবেগ ও উপলব্ধিতে শব্দোচ্চারণের একটি জটিল স্বতন্ত্র রীতি।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে।

অর্থাৎ শব্দব্যবহারের কৌশলেই তিনি নতুন উচ্চারণ সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতার নিজস্ব সংগীত। বিষ্ণু দে-র কবিতা প্রসঙ্গে সংগীতময়তার কথা বারবার উঠেছে। বোধহয় এই কারণেও যে সাংগীতিক উপমা বা প্রতিমা তিনি অবিরল ব্যবহার করে চলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বুঝতে সংগীতবোধ সত্যিই সাহায্য করে নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বভাবতই এই ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য এসেছে মূলত তাঁর শব্দচেতনা থেকেই। সাংগীতিক নানা রীতি তাঁর কবিতার চলনে উপমিত হতে পারে, কিন্তু তা তাঁর শব্দব্যবহারকৌশলের অমোঘ শক্তির বশবর্তী হয়েই এসেছে। সংগীতের সুরছোঁয়া থাকার ফলে

হয়তো ভিন্ন মাত্রা এসেছে—কিন্তু তাঁর প্রকরণের নন্দনকে ধরতে হলে এই শব্দ-কৌশল থেকেই যেতে হবে সংগীতের দিকে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাবীন্দ্রিক মাত্রাছন্দকে নিজের স্বরে বাজিয়েছেন বিষ্ণু দে, এই বলে প্রশংসা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।[৭] বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের আদি প্রয়োগের কথাও বলেছেন বুদ্ধদেব বসু।[৮] শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন, এ তো বাইরের কথা। আসলে প্রথম থেকেই তাঁর প্রবণতা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দসঞ্চার করার তাগিদে ছন্দের সব কটি একককেই অতিক্রম করা।[৯] স্তবক গঠনে, পঙ্‌ক্তির সংখ্যা বা আকার কিংবা পর্বসংখ্যা নির্ধারণে তিনি ভাঙতে ভাঙতে চলেন, বৈচিত্র্য আনেন, দ্রুত ছন্দবদল করেন, এক চাল থেকে আরেক চালে চলে যান, এক লয় থেকে আরেক লয়ে।

শুধু স্তবকের পরিসীমার মধ্যেই নয়—দীর্ঘ কবিতার গড়নেও এই বৈপরীত্যের সমাবেশ। কখনো তা তাই ইওরোপীয় সংগীত সিমফনির গড়নের সঙ্গে তুলনীয়—পয়েন্ট/কাউন্টার-পয়েন্টের মধ্য দিয়েই কবিতারও মুভমেন্ট। কিংবা কারোর যদি সিমফনির সুনির্দিষ্ট সুনিরূপিত কাঠামোর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কবিতা সর্বত্র তুলনীয় মনে না হয়, কেউ তুলনা করতে পারেন ফ্যুগ-এর দ্বন্দ্বপ্রবাহের সঙ্গে, যেমন করেছিলেন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।[১০] কিংবা ভারতীয় রাগ-সংগীতের মতোই, কারোর মনে হতে পারে, এর গড়ন স্বাধীন ও বিকাশোন্মুখ।[১১] কিন্তু সর্বত্রই, এমনকি শেষোক্ত ক্ষেত্রেও তাকে তিনি উপস্থিত করেন বৈপরীত্যেরই বিন্যাসে।

বলাই বাহুল্য, এই ছন্দ, এই ভাষা, কবিতার এই গড়নই তো তাঁর কাব্য-স্বভাবের অনিবার্য আশ্রয়—বহু বিষয়, বহু মাত্রা, বহু স্বরের জটিল বিন্যাসে গাঁথা কোমলেকঠোরে মন্দ্রিত মহাকাব্যিক কবিস্বভাবের ভাষা। আর তা অর্জিত হয় প্রশান্ত নির্বাচনে নয়—যে কথা বিষ্ণু দে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দর্জির মাপ নিয়ে জামা তৈরি নয়—জীবনের যে টেনশন বা চাপ থেকে তাঁর কবিতার জন্ম, তারই দাবি এই ভাষা। এক-অর্থে তাই দ্বন্দ্বময় ব্যাপ্ত জীবন থেকেই তিনি কবিতার ভাষা সংগ্রহ করেন। তিনি জানেন, 'এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা'।

# কবির জন্ম

১৯০৯—১৯৩৩

## 'ভিড়েও নিঃসঙ্গ শিশু পৌঁছে গেল মোহানার প্রান্তিক খাড়িতে'

'বিষ্ণু দে-র জন্ম ১৯০৯ সালে—কলকাতা শহরে, উনিশ শতকের বঙ্গীয় জাগরণের সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যসম্পন্ন এক যৌথ পরিবারে।' এই বাক্যের সব কটি তথ্যের ইঙ্গিত গ্রহণ করলেই তাঁর জন্মের যথাযথ পশ্চাদ্‌ভূমি বোঝা যাবে।

প্রথমত, তাঁর জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। পরাধীন ভারতবর্ষে। তার জন্মের বছরটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯) আগে বটে—কিন্তু তাঁর শৈশবের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সেই বিশ্বযুদ্ধের অবসান—অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর অব্যবহিত কালটাই তাঁর শৈশবের যথার্থ কাল। এই সময়ই তো ভারতবর্ষ, এবং সেই সূত্রে বাংলা দেশও রাজনীতি-অর্থনীতির দিক থেকে এক নতুন পরিস্থিতিতে এসে পড়ল। সময়টা এক-অর্থে গান্ধীর কাল, ঠিক যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল। কিন্তু সেটা খুব সহজ করে বলাও যায় না আবার। নানা জটিলতায় আবর্তিত সময়। গান্ধীর আত্মপ্রকাশের গৌরবময় কাল যেমন, বাংলা দেশের দিক থেকে, গান্ধী-বিরোধিতারও কাল। এমনকি সে-বিরোধিতা কোনো-কোনো সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও। তা ছাড়া ভারতবর্ষে, বিশের দশকে, যে নানা ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠছিল, তাতেও সময় হয়ে উঠেছিল উত্তাল।

দ্বিতীয়ত, তাঁর জন্ম কলকাতা শহরে। আজকের দিশাহারা কলকাতা নয়, বিশ শতকের গোড়াকার কলকাতা। আজ পরিচয়লোপী মেট্রোপলিস, বিপর্যস্ত দূষিত নোংরা শহর, কিন্তু তখন এই জীবন্ত শহরে এর চেয়ে অনেক বেশি সৌন্দর্য ও অবকাশ ছিল, ছিল গোটা শহরের, এমনকি প্রত্যেক অঞ্চলের আলাদা আলাদা স্থানীয়তার উত্তাপ। তদুপরি উত্তর কলকাতার বনেদি কায়স্থ

পরিবারগুলির মধ্যে একটা জড়ানো ভাব তো ছিলই। বিষ্ণু দে সেরকমই এক পরিবারের সন্তান।

তৃতীয়ত, যে পরিবারে তিনি জন্মান সেই পরিবার ছিল বাংলা দেশের উনিশ শতকের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।[১] তাঁর ঠাকুর্দার বড ভাই শ্যামাচরণ দে উনিশ শতকের বিখ্যাত পুরুষ। সংস্কৃত কলেজের উল্টোদিকে শ্যামাচরণ দে-র বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রমুখেব যাতায়াত ছিল। ঠাকুর্দা বিমলাচরণ দে-ও যুক্ত ছিলেন এই উনিশশতকী আবহাওয়া ও কার্যকলাপের সঙ্গে। এ-ব্যাপারে পারিবারিক গর্ববোধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বিষ্ণু দে ছোটবেলায় উনিশশতকী মহাপুরুষদের ও পূর্বপুরুষদেব সম্পর্কে নানা কাহিনী চালু ছিল পরিবারে।[২]

যৌথ পবিবারটি ছিল বৃহৎ। যৌথ পরিবারের অনেক দোষ হয়তো আছে, কিন্তু পরিবার বৃহৎ হলে বিভিন্ন আত্মীয়দের সাহচর্যে যে বিভিন্ন সম্পর্ক ও অনুভূতির জগৎ গড়ে ওঠে, তা শিশুব বিকাশের পক্ষে অনুকূল : এ-কথা অনেক মনস্তাত্ত্বিকই বলেছেন। সেই সৌভাগ্য বিষ্ণু দে-র ছিল। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাতেও যৌথ পরিবারের উত্তাপ ও বিভিন্ন পাবিবারিক সম্পর্কের হৃদ্যতা বর্ণিত হযেছে।[৩]

বিষ্ণু দে ছোটবেলা থেকেই শারীরিক দিক থেকে খুব রুগ্ন ছিলেন। ফলে শিশুমনের পক্ষে অনুকূল যৌথ পবিবারের পবিবেশে, অনুভূতি ও কল্পনার বিস্তারেব যে সুযোগ তা তো ছিলই, তার ওপর ঐ রুগ্নতার জন্যই তাঁর প্রতি স্বতন্ত্র পারিবারিক প্রশ্রয় ও মনোযোগও ছিল। যৌথ পরিবার ও শ্যামাচরণ-বিমলাচরণের ঐ বিরাট বাড়ির ছড়ানো স্থাপত্যে তিনি যেমন ইচ্ছে মতো ঘুরেছেন, বেরিয়েছেন, পড়েছেন, নানা ধরনের স্বাধীনতা পেয়েছেন, তেমনি ছোটবেলা থেকেই তিনি হয়ে পডেছিলেন লাজুক, স্পর্শকাতর, তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল। এবং ক্রমশই অন্তর্মুখী। কিন্তু, পাশাপাশি, ছোটবেলা থেকেই এর ক্ষতিপূবণ হিসেবেই যেন, তিনি পেয়ে গেছেন মনের জোরও—অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও মানসিক স্বাস্থ্য।

বিষ্ণু দে স্কুলে যেতে শুরু করেন একটু বেশি বয়সে—১৯১৯ সালে, দশ বছর বয়সে। ভর্তি হন চতুর্থ শ্রেণীতে। তার আগে বাড়িতে পড়তেন মা-বাবার কাছে। ঐ দশ বছর বযসেই 'সন্দেশ' পত্রিকায় পদ্যলেখাব

প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। সেই ওঁর 'প্রথম রচনা'। এই রচনাটির বিষয়ে বিষ্ণু দে অনেক জায়গাতেই কিছুটা কৌতুক-মিশ্রিত বর্ণনা দিয়েছেন। কৌতুক, কেননা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গরজ, বা তাঁর নিজেরই ভাষায় 'ব্যক্তিত্বের বাইরে নিজস্ব তাড়না' তখনও শুরু হয় নি। 'কি করে লেখক হলুম' এই আত্ম-পরিচয়মূলক রচনায় তাই তিনি পরোক্ষ উক্তি করেন, 'এই চাপের বোধ সব সময়ে এক কবিব্যক্তির মনে থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই, অভ্যাসিকতার বল অর্জনে আত্মীয় বন্ধুর বিবাহপদ্যও সে লিখে ফেলতে পারে, উপলক্ষ্যের তাগিদে অথবা নির্বন্ধে। এমনকি নিছক দশ টাকা পুরস্কারের লোভেও বালক তার প্রথম কবিতা লিখে বালকবালিকোচিত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় পাঠাতে পারে। এবং পুরস্কারটা না পেলেও কবিতা লেখার বা পদ্য রচনার মজাটা পেয়ে যায় আর লিখে যেতে চায় নিজের নানারকম কৌতূহলের খুশিতে, যদিচ সে খুশি মুখাপেক্ষী হয়—কালোচিতভাবেই—সত্যেন্দ্রদত্তজ বাহাবের।'[৪] পরবর্তী আরেক বর্ণনায় এই কাহিনীর তথ্য আরো সম্পূর্ণতা পায়: 'আশ্চর্যের বিষয়ই বটে, আমি আমার পদ্যরচনার প্রথম পর্বকে মনে করতে পারি। ছোটদের একটি নামী পত্রিকায় কিছু চিত্র অবলম্বনে কবিতা চাওয়া হয়েছিল এবং পুরস্কারের উল্লেখও ছিল···আমি চেষ্টায় রত হলুম, অংশত কারণটা এই যে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর লেখাটা একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় এবং অংশত, এখন আমি নিশ্চিত [ উদ্ধৃতিটি জ্ঞানপীঠপুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের অংশ ], কারণটা এই যে তাতে পুরস্কারের ঘোষণা ছিল। খবর পাওয়ার জন্য ডাকটিকিট সহ লেখাটি এনভেলাপে মুড়ে আমি পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু বলা বাহুল্য জবাব এল না। তবু এটা শুরু করে দিল আমার আবিষ্কারের চেতনা, আমার সেই আবিষ্কারকে লিখে ফেলার মজা, সব রকমের ছন্দে সব রকমের পদ্য লেখার উল্লাসের চেতনা। যদিও তেরো বা চোদ্দ বছরের আগে কিছুই ছাপা হয় নি, কিন্তু আমি জেনে গেছি লেখা ব্যাপারটা উত্তেজনা ও আবিষ্কারে ভরপুর, ঠিক যেন রুশ স্তেপভূমিতে বালক ছুটিয়েছে ঘোড়া।···কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ লেখক তরুণ বালকের ছন্দের দক্ষতাকে প্রশংসাও করতেন। এখন আমি যখন পেছনে ফিরে তাকাই সেই যৎকিঞ্চিৎ বাকপটু পদ্যরচনার দিনগুলোর দিকে, তখন নিজেকে অন্তত ধন্যবাদ দিই এই জন্যে যে কোনো এক নাটকীয় আতিশয্যের ঝোঁকে আমি প্রায় দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'[৫]

পদ্যরচনার অবিশ্রান্ত মজা থেকে ক্রমশ এক পা করে-করে তিনি বোধহয় প্রবেশ করেছেন কবিতার জগতে, ক্রমশ অর্জন করেছেন আত্মপ্রত্যয়, অন্তত ছাপানোর কথা ভাবছেন প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায়। 'এমনকি জিজ্ঞাসু—আর যশোলিপ্সুও বটে—আত্মপ্রসাদে একটি রীতিমতো পদ্যরচনা [ রামমোহন রায় সম্পর্কে সনেট ] প্রবাসীর মতো তখনকার উচ্চবর্ণ পত্রিকায় পাঠিয়েও দেয়। আর একটু অবাকই হয়—যখন ডাকটিকিটটাও ফেরৎ আসে না। উল্টোদিকে আবার অবাক হয়ে যায়—কিছুকাল পরে বিচিত্রা পত্রিকার কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্বতপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাসে। যেমন খুশি হয় ঢাকার প্রগতি পত্রিকার বুদ্ধদেব বসুর বিস্মিত চিঠি পেয়ে অথবা কল্লোল-এর দীনেশ দাশ ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তর সমর্থনে।'[৬] কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসব তাঁর নিজেরই ভাষায় 'ছন্দমিলের পালা-কীর্তন' ছাড়া তো আর কিছুই নয়।

অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছুটা স্থানাভাবের এবং অন্য নানাবিধ পারিবারিক কারণে বিষ্ণু দে-র পিতা নিজের সংসার নিয়ে উঠে এলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের ছোট বাড়িতে।[৭] সম্ভবত সেটা ১৯২২ সাল। বিষ্ণু দের বয়স তেরো। যৌথ পরিবারের উত্তাপ থেকে সরে আসার ক্ষতিটা সুদে-আসলে পূরণ হয়ে গিয়েছিল পিতার অন্তরঙ্গ সাহচর্যে। এই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং স্বভাবের দিক থেকে দৃঢ় ও কোমল ব্যক্তিটি কিশোর-পুত্রের মন গড়ে তোলার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিলেন। প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না তাঁর পুত্রদের প্রতি। তাদের পড়াতেন ধৈর্য সহকারে, আবার বন্ধুর মতো কথাবার্তাও চলত, এমন কি মাঝে-মাঝে নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও। সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন উদার—এমনকি শিক্ষার ব্যাপারেও। তাঁরই আনুকূল্যে বিষ্ণু দে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বই কিনে কিনে একটা নিজস্ব লাইব্রেরিও গড়ে তুলেছেন শৈশবে। পুত্রের কবিতারচনাতেও তাঁর যথোচিত আগ্রহ ছিল। পুত্রও পরিণত বয়সে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন পিতার সহজাত রুচি ও সাহিত্যজ্ঞানের বিষয়ে। সংবেদন গড়ে-ওঠার এই পর্বে পিতাই বোধহয় সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিলেন—তিনি নিজেই বলেছেন কথোপকথনের ভাষ্যে: 'আমি যা কিছু হতে পেরেছি, যা আমার মনে ইচ্ছে ছিল হবার—সবটা নিজের জীবনে সফল হয় নি নিশ্চয়—কারুরই কখনই তা হয় না—তবু যতটুকু আমি করতে চেষ্টা করেছি এবং সফল হতে পেরেছি সেটা বাবা আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই।'[৮]

প্রভাবের দিক থেকে এর পরই বিবেচ্য তাঁর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা। বিষ্ণু দে প্রথমে ভর্তি হন বাড়ির কাছে মিত্র ইনস্টিটিউশনে, স্কুলজীবনের শেষ দুটি বছর সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। বিষ্ণু দে পরীক্ষার রেজাল্টের বিচারে কোনো সময়েই অসাধারণত্বের পরিচয় দেন নি, নিজেরই ভাষায়, তিনি ছিলেন 'পরীক্ষার নীচের তলার ভাড়াটে'।[৯] অথচ এ-সময়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল নানা বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা ও পড়াশোনার অভিযান। পদ্যরচনা। ফলে কোনো কোনো শিক্ষক তো ছিলেনই, যাঁরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য এই বালক বা কিশোরটির প্রতি শুধু স্নেহই অনুভব করতেন না, তাঁর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে দিতেন প্রায় সাবালকত্বের মর্যাদা।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। খুব তারিফ করতেন ছাত্রের লেখা। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়। তখনই চিত্রকলার ব্যাপারে ছাত্রের উৎসাহ দেখে আর্ট-অ্যালবাম কিনে দিতেন। সর্বোপরি ছিলেন পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। স্বরচিত 'চার্বাক দর্শন' উপহার দেন সমুৎসুক ছাত্রকে। নানা বিষয়ে তর্ক এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নানা আলোচনা হত ওঁর সঙ্গে পড়ার সময়।[১০]

বাল্যবয়স থেকেই এই যে আত্মীয়পরিজন, শিক্ষক এবং সর্বোপরি পিতার কাছ থেকে বয়স্কমর্যাদালাভ এসবই নিশ্চয়ই বিষ্ণু দে-র মানসিক গঠনকে ত্বরিত এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং খুব অল্প বয়সেই পরিণত রচনা লিখে যে তিনি অনেককে বিস্মিত করেছিলেন, তা ঘটতে পেরেছে।

কিন্তু মনের এই সুখী ও স্নিগ্ধ পরিবেশ ব্যাহত হতেও শুরু করেছিল এই বয়স থেকেই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্পর্কিত রচনা পাঠান্তে বালক বিষ্ণু দে 'প্রচলিত শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা' অনুভব করে স্কুল ছাড়তে চেয়েছিলেন। তখনও সহৃদয় পিতা ক্রুদ্ধ হন নি, শাসন বা হুকুম করেন নি—পুত্রের সঙ্গে বয়স্ক মতবিনিময় করেছেন। বড় জোর নিজের বন্ধুবান্ধব বা শুভানুধ্যায়ী মারফৎ বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু জোর খাটান নি। আর তারই ফলে বিষ্ণু দে রয়ে গেলেন স্কুলে।[১১] সংকটটা গৌণ ছিল বলেই হয়তো তার নিরসন হতে পেরেছিল পিতার এই আচরণের ধরনেই শুধু নয়, অন্য নানাবিধ স্বাধীনতালাভে —বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় যাওয়া-আসা, বয়সে-বড় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি নানা নতুন অভ্যাসে গড়ে-ওঠা আত্মপ্রত্যয় ও মানসিক পরিপক্কতার

অধিকারে।

আর প্রায় তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল তাঁর নান্দনিক যাত্রারম্ভ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভাবিত বা বিবিধ কল্লোলীয় হাওয়া ছেড়ে তিনি বেছে নেন প্রমথ চৌধুরীর প্রকরণের জগৎ। লেখা হতে থাকে 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর কোনো-কোনো কবিতা, 'চোরাবালি'-র বেশ কিছু 'লঘু' কবিতা—ট্রিয়োলেটগুচ্ছ। শিল্পসাহিত্য বিষয়ে নানা প্রবন্ধ তো বটেই, এমনকি গল্পও লিখছেন তখন প্রমথ চৌধুরীর আদলে। ক্রমশই তন্ময় হয়ে উঠছেন নিজের সাহিত্যিক ব্রত বিষয়ে।

বিষ্ণু দে-র জীবনের একটা বড় সংকটও কিন্তু দেখা দিল তাঁর লেখার এই উর্বর সময়েই। সংকটের বীজ নিশ্চয়ই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে ছিল। নানা বৈপরীত্যে টালমাটাল সেই পরিবেশে। গান্ধীজীর আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ দুটোরই সহজ-অসহজ রূপ এই বাংলাদেশে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তো ঘুরেফিরে আসেই। বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষায়, তখন 'গান্ধীজির নীতির গোধূলি' এবং 'রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলাহাওয়ার ধ্যানধারণা।'[১২] শ্রমজীবীর আন্দোলনও ক্রমশ দানা বাঁধছে। 'যন্ত্রণার মুঠিতে...আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা।'[১৩] ১৯২৭-এর 'নৈরাশ্যের বছর' যেন ১৯২৮-এ এসে হয়ে উঠল উদ্দীপনাময়।

রাজনৈতিক-সামাজিক সচলতার এই সময়টিতেই যখন তিনি ক্রমশ সৃজনের আনন্দে ভরপুর, শৈশবের 'অন্তর্মুখী' মন হয়ে উঠছে 'নানা জ্ঞানে দ্বিধাহীন'—তখনই আবার চারপাশের ক্লিন্ন পরিবেশের বিরুদ্ধতায় তাঁর শৈশবের শালীনতা ও শুচিবোধ আহত হচ্ছে প্রবলভাবে। শরীর ও মনের দ্বন্দ্বের চেহারা তিনি যেন এই প্রথম উপলব্ধি করছেন। সৃজনের উল্লাসের মুহূর্তেই আহত সংবেদনের এই আর্তি সমস্ত স্নায়ুতে ঘা দিচ্ছে। তাঁকে এনে ফেলছে গভীরতর সংকটের মধ্যে। সেই সংকট দাবি করছে নন্দনের আরো কোনো লিপ্ততা।

সংকটমুক্তি যেমন কোনো একটি ঘটনার আশ্রয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে—সংকটবরণও তেমনি শুরু হতে পারে কোনো ব্যক্তিগত আপাততুচ্ছ অভিজ্ঞতার ঘটনায়। এমনকি তা হতে পারে পরীক্ষার আগের রাত্রে প্রতিবেশী যুবকের লাম্পট্যে ব্যথাহত মা এবং তরুণী বধূর বেদনার্ত করুণ চোখ দেখেই—স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এমনই দৃশ্যের স্থূলতা ও কারুণ্য। বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষ্যে জানতে পারি, 'এই দৃশ্যটাতে আমি খুব শকড হই। পরের দিন পরীক্ষা দিতে পারি নি। এক বছর রাত্রে ঘুমোতে পারি নি। লিখে লিখে কবিতা ছিঁড়ে

ফেলে দিয়েছি।'[১৪] পরে অন্য প্রসঙ্গে লেখেন, 'হ্যাঁ, আমার মধ্যেও ছিল সংকট বা ক্রাইসিস। খানিকটা যেন আততির হর্ষে স্নায়ুর ছিলার টান। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি শারীরিক দিক থেকে ছিলুম চমৎকার, কিন্তু নিদ্রাহীন।'[১৫]

প্রায় বছরখানেক এই নিদ্রাহীন মানসিক চাপের মধ্যে কাটাবার পর হঠাৎই যেন তার মুক্তি ঘটল তাঁর হাত দিয়ে কবিতার দশটি লাইন লেখার সঙ্গে সঙ্গে। ৯ লাইন কটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় তিনি জুড়ে দেন। শৌখিন চনার পর্ব থেকে লেখার একনিষ্ঠ ব্রতে পৌঁছনোর ইতিহাসকে বিষ্ণু দে নজেই বিবৃত করেছেন এই ভাবে: 'এই ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পরে এল বনিদ্র "জন্মাষ্টমী"-র শেষাংশের আরম্ভের অসম্পূর্ণ গোটা দশেক লাইন। · কিন্তু ঝোঁকটা বোধহয় অন্তরঙ্গই ছিল, কারণ সবটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রায় বছর শেক পরে হঠাৎ এবং প্রাথমিক দশ লাইন স্বতষ্ট এসে গেল বিলক্ষণ দীর্ঘ কবিতা "জন্মাষ্টমী"-র ·।'[১৬] ঠিক একই কথা অন্যত্র লিখেছেন: 'আমার মনে াড়ে কিভাবে আমার চতুর সাবলীল রীতির কবিতার মেজাজ রূপান্তরিত হল প্রকাশভঙ্গির দ্বিধান্বিত কিন্তু আবিষ্কার-উন্মুখতায়। আরো মনে পড়ে কিভাবে এক রাত্রে লাইন দশেক চলে এল প্রায় স্বয়ংক্রিয় লিখনভঙ্গিমায়—প্রায় ৮/৯ বছর পরে সেই লাইনগুলোই 'জন্মাষ্টমী' নামক অতিশয় দীর্ঘ কবিতার মধ্যে এসে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এবং সক্রেটিস-খ্যাত ডিয়োটিমার উদ্দেশ্যে নাটকীয়ভাবে সম্বোধিত অন্ধকার যাত্রা-বিষয়ক আরো আগের একটি কবিতাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।'[১৭] 'জন্মাষ্টমী' সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৩৬ সালে—সুতরাং সেই 'অন্তরঙ্গ ঝোঁকে' রচিত অংশটির সময়সীমা, দু-এক বছর আগে পিছে ধরলে, ১৯২৮-২৯-৩০ সালের মধ্যেই হবে—অর্থাৎ যে বছরগুলিতে কবির মানসিক সংকট ও তার উত্তরণের চাপ খুব বেশি বাস্তব ছিল। 'এই প্রথম সংকটযুগের গোড়ার দিকেই লেখা হয় "উর্বশী ও আর্টেমিস"-এর সেই সব কবিতা, "চোরাবালির" র কিছু কিছু ভের দ সোসিয়েতে মার্কা লঘু কবিতার পরের লেখা, যাতে লেখকের লিখনচৈতন্যও ছিল সংকটদীর্ণ কিন্তু আবার উল্লসিতও, ভাষাও ছিল তাই দ্বিধান্বিত কিন্তু স্বাধিকৃত, ছন্দে মিলে কর্তৃত্ব হয়তো সময়ে-সময়ে মনে হয় গৌণ—প্রচ্ছন্ন একটা মুক্তিবোধের নন্দিত চৈতন্যে, কিন্তু যে মুক্তি ছিল অনিদ্রাতত স্নায়ুর জ্যা-মুক্তি।'[১৮]

'অন্ধকার যাত্রা-বিষয়ক আরো আগের একটি কবিতা' বলে যেটি উল্লেখ

করেছেন বিষ্ণু দে, তার কথাই প্রথমে ধরা যাক। কবিতাটির নাম 'যাত্রা'—'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ১ম সংস্করণে স্থান পেয়েছিল। পরে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর যে কবি নিজেকে মনে করেছেন 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক, সেই কবিই এখানে কঠিন একাকীত্বের মুখোমুখি হয়েছেন।

অমাবস্যা-তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলি ঠেলি কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের মাঝে পথ করি
চলিয়াছ সঙ্গীহীন কি উদ্দেশে কঠিন যাত্রায় ?
নাহি ভয় রজনীর,
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নাহি তব, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, জীবনের নাহিকো ঠিকানা
জনশূন্য সিক্তবালু সৈকত-উপরি
চলিয়াছ স্থিরদৃষ্টি একা।
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, শুধু আছে আকাশ-ছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর হাসি আঁধারের।

কঠিন উদ্দেশ্যহীন সঙ্গীহীন এই যাত্রায় কিন্তু একাগ্রতা ও তীব্রতার কোনো অভাব নেই—তাই 'চলিয়াছি স্থিরদৃষ্টি একা' এবং এ যাত্রাকে বলা হয়েছে 'অসিধার ব্রত', অসির ভয়ংকর ধারের উপর দাঁড়িয়ে ব্রতপালনের নিষ্ঠা। বৈপরীত্য এখানেই যে সেই ব্রতের কোনো লক্ষ্য নেই এবং যে-অন্ধকার সঙ্গীহীন দ্বান্দ্বিক পরিহাসে সেই যাত্রারেই বলা হয়েছে 'অভিনব জয়যাত্রা' এব অন্ধকারেই সন্ধান পাওয়া গেছে 'রাত্রি-আঁধারের উদ্দাম প্রণয়'। বৈপরীত্যে এই তীব্রতাতেই কবি বলেন:

তুমি শোনো নাই বুঝি গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সংকটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করিছে একেলা ?

উদ্দেশ্যহীন অন্তহীন নিঃসঙ্গ যাত্রায় বাধ্যতামূলক এই অংশগ্রহণ—'এব ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তি-দেশে/যাত্রা কভু যাবে না থমকি'- এর মাঝখানে কবির প্রত্যাশা শুধু গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে এই নিষ্ফল যাত্রা রোধ করার, ক্ষান্ত করার 'মিনতি'-তে। সংকটমোচনের জন্য এই আকুতিই সক্রেটিস-খ্যাত

প্রেরণাদাত্রী ডিয়োটিমার প্রতি সাহায্যপ্রার্থনারা আবেদনে রূপ পায়।

'জন্মাষ্টমী' কবিতার যে লাইন দশেক অংশটির কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, তাকে এবার চোখের সামনে আনা যাক।

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাট পাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধকান্তি পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।

বলা বাহুল্য, আত্মপ্রকাশের ও সত্তার যে সংকটে পীড়িত ছিলেন কবি, সেই সংকট-চেতনার ও মুক্তির সাক্ষ্য লাইন কটি। বিষ্ণু দে-র এই নিদ্রাহীন সংকট ও সংকট-মোচনের স্ফূর্তি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র কবিকে এবং সে-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র নিজের ব্যাখ্যাকেও।[১৯] সেই ব্যাখ্যায় জানতে পারি কিভাবে আত্মপরিচয়ের কৈশোর-সংকট এড়িয়ে 'দ্বিধান্বিত কবির চরণ মুক্তি পেল বিশ্বসাহিত্যের খোলা দরবারে' এবং ব্যক্তিপরিচয় ও কবিপরিচয়ের অভিন্নতার বোধে। কিন্তু এ-যুগের কবির কাছে মুক্তির উল্লাস ভাষা পায় বৈপরীত্যের চেতনার জমিতে—তাই 'স্থবির রাত্রি'-র পাশে 'আবেগ', 'দ্বারকার দস্যুভয়'-এর পাশে 'ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর'। এবং সবকে ছাপিয়ে প্রতীক্ষার স্থৈর্য, যে প্রতীক্ষার কথা বারবার ফিরে এসেছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের অনেক লাইনেই। এই বৈপরীত্যের এবং প্রতীক্ষার টেনশনের পরোক্ষতাতেই তিনি মুক্তি পান সংকটের ব্যক্তিগত থেকে।

এই সংকটমুক্তির কালে যে-প্রভাব বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে কাজ করেছিল, তা হল টি. এস. এলিঅটের প্রভাব। এই প্রভাব কাজ করে গেছে দীর্ঘকাল যদিও তা ক্রমশই গ্রহণেবর্জনে হয়ে উঠেছে খুব জটিল—কিন্তু সে তো পরের কথা। ১৯৩০ সালের আগেই এলিঅটের রচনার সঙ্গে বিষ্ণু দে-র

যে সাক্ষাৎকার, সে-ঘটনা তিনি বিবৃত করেন এই ভাবে : 'তারপর এল আকস্মিক-ভাবে আমাদের পটলডাঙা পাড়ার পুরোনো বই-এর কারবারী ইউসুফ-এর দাক্ষিণ্যে'এলিঅটের "দি সেকরেড উড" আর "পোয়েমস ১৯২৫"। পুরোনো কিন্তু শস্তা—টাকা টাকা। কিন্তু প্রায় আনকোরা অবস্থায়। এলিঅট সাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটাকয় মার্কিন কবিতার সংকলনে। তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা "দি ক্রাইটেরিঅন" চোখে দেখি নি।'[২০] আর-এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, সংকটমুক্তির পর দ্বিতীয় পর্ব এই এলিঅট-আবিষ্কার—'টি. এস. এলিঅটের "কবিতাবলী ১৯২৫" এবং "সেকরেড উড", আমার ঐ নব-আবিষ্কারই কি বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব ছিল না?'[২১] ঐ প্রবন্ধে প্রসঙ্গান্তরের পর আবার তিনি লিখলেন, 'আবার আমি স্মরণ করি এখানে টি. এস. এলিঅটকে। তাঁর "ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক গুণপনা" আমাকে আমার বিকাশে সাহায্য করেছিল প্রচুর।'

এলিঅটের কাব্যের প্রকরণও বিষ্ণু দে-কে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই এবং তার সাক্ষ্যও রয়েছে অনেক এ-সময়ের কবিতায়—কিন্তু এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এলিঅটের কবিতার ও কাব্যনন্দনের ঐতিহাসিক প্রেরণাই বিষ্ণু দে-র কাছে তো বটেই, সে-যুগের আরও কারো কারো কাছে প্রধান ব্যাপার ছিল। সেজন্যই তিনি বলেছেন, 'বাংলা দেশে এলিঅট'[২২], বারবার উল্লেখ করেছেন তৎকালীন সাহিত্যিক বা এমনকি রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক পরিবেশে এলিঅটের ভূমিকার কথা। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত উভয় প্রয়োজনেই এলিঅটের কাব্যতত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা ও আত্মসচেতনতার চর্চাই তিনি জরুরি মনে করেছিলেন। 'ছন্দমিলের পালাকীর্তন' শেষ করে পথ-সন্ধানের এই সংকট-পর্বেই তিনি এলিঅটকে পেয়েছিলেন সংকটমুক্তির সহায়ক প্রেরণা হিসেবে, তাঁর কাব্যে ও কাব্যতত্ত্বে উভয়তই।

ঠিক এই সময়েই, এলিঅটের ঐতিহাসিক প্রেরণার সমকালেই যে-সব সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্বের সূত্র এই এলিঅট-ই। তিনি লিখেছেন, 'অচিরে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগে জানতে পারলুম যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের [ এলিঅটের ] মুগ্ধ পাঠক। কৌতূহল থেকে, বলা যায়, এলিঅট-পাঠের নন্দিত উত্তেজনা থেকে হল সামাজিক সম্বন্ধোত্তর সাহিত্যিক সৌহার্দ্য।'[২৩] এরকমই আরেকজন ছিলেন 'চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের

জামাতা অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ'—'এলিঅটের জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল' তাঁর।[২৪]

বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সঙ্গে তাঁর এলিঅট-কেন্দ্রিক মতবিনিময় এবং ক্রমশ নিবিড় সৌহার্দ্য কবিতারচনার প্রথম পর্যায়ে যে অসামান্য সহায়তা দান করেছিল, সে-কথা বিষ্ণু দে পরিণত জীবনেও বারবার স্মরণ করেছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তিনি সুধীন্দ্রনাথ-রচিত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটির—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ঘরোয়া ছাত্রসভায় পঠিত এই প্রবন্ধের প্রাথমিক ভাষ্যেই এলিঅট-বিষয়ে 'কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা'।[২৫]

বিষ্ণু দে-র উপর এলিঅটের প্রভাব সম্পর্কে নানারকম অতিশয়োক্তি এড়ানো যাবে যদি আমরা ঘটনাটিকে এইভাবে ঐতিহাসিক ক্রমে দেখি। কেননা সে-যুগেও এলিঅটের কবিতার প্রভাব তাঁর উপর ছিল খুবই বহিরঙ্গ—কিছু প্রকরণ বা কলাকৌশলকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রথম থেকেই তাঁর পথের ভিন্নতা সম্পর্কে এখন আর কারোরই সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই সময়ে এলিঅটের নান্দনিক অনুপ্রেরণা তাঁর কাছে একটা বাস্তব ব্যাপার—পরবর্তীকালে এলিঅট সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র যে সমালোচনামূলক বা দ্বান্দ্বিক মনোভাব গড়ে ওঠে, তার প্রাসঙ্গিকতা ছিল না তখনও। পথ সন্ধানের তীব্র সংঘাতে ও আলোড়নে এলিঅটের সঙ্গে পরিচিতিই তাঁকে উচ্ছ্বসিত করেছিল। 'এলিঅটের সেক্রেড উড-এর অন্তত দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদেরও কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে এবং এইরকম আলোকিত ধাক্কা ফলপ্রসূ হয়—অন্তত তাই আশা করেছিলুম—কারণ তখন মনে হয়েছিল এই রকমই তো আমরাও ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। এবং তাঁর 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' নামক তখনকার দীর্ঘতম কবিতাটি বিচলিত করে এত গভীরভাবে যে লাইনগুলো ঘরে-বাইরে ট্রামে-বাসে মনে গুঞ্জরিত হত, এমনই জাদুর ভয়ঙ্কর লিরিক্‌ল্ শক্তি, একটা ঘোরের মধ্যে বহুকাল কাটে তীব্র নান্দনিক আততিতে।'[২৬]

এলিঅটের আবির্ভাবের মুহূর্তটিকে তাহলে বুঝে নেওয়া দরকার কবি-ব্যক্তিত্বের ঐ নানা চাপের ইতিহাসে। বিশের দশকেই তাঁর সত্তার ঐ নিদ্রাহীন সংকট। সংকটমুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে এলেন এলিঅট। 'স্নায়ু তখন এক পাহাড়ের চূড়ায়'।[২৭] এলিঅটের পরে পরেই যিনি এলেন তিনি বেঠোফেন। বেঠোফেনের নাইন্‌থ্ সিমফনির প্রভাবের কথাও বলেছেন বিষ্ণু দে—'জন্মাষ্টমী'

কবিতাটিও শেষ হয়েছে স্নায়ুর মুক্তির ঐ উল্লাসে। 'বেঠোফেনের অন্তিম সংগীতের আলোয়'।[২৮]

.

এর পাশে-পাশেই চলেছে সাহিত্য-শিল্প-সংগীত বিষয়ে বিষ্ণু দে-র ব্যাপক আগ্রহ ও চর্চার অভিযান। দু-হাত মেলে যেন তিনি মানবসভ্যতার সমস্ত সম্পদকে আহরণ করার শক্তি অর্জন করে চলেছেন। সাহিত্য তো বটেই। 'পেশাদার ছাত্রের খ্যাতি'[২৯] ছিল না, কিন্তু স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের উদগ্র পাঠক—সে-সময়ের বন্ধুদের ভাষায় 'বইয়ের পোকা'। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পুরাণের মধ্যে ডুবে আছেন তিনি, যার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে। একদিকে প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের ইওরোপীয় সাহিত্যের চরিত্র বা ঘটনা, অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য-এর বিস্তৃত জগতে তিনি বসবাস করছেন গভীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি নিয়ে—তার চকিত উল্লেখ নানাভাবে এসে পড়ছে কবিতায়। বাংলা কবিতার সামগ্রিক ইতিহাস-পঠনের অভিজ্ঞতাও সেখানে। চিত্রকলা ও সংগীতের কালানুক্রমিক জ্ঞানও তিনি অর্জন করতে চান। বলা বাহুল্য দেশ ও বিদেশের সমস্ত শিল্প-অভিজ্ঞতাই। আধুনিক নাগরিক শিল্পই কেবল নয়, লোকশিল্প বা লোকসংগীতের সমঝদারিতেও গভীর আগ্রহ। শুধু শিল্পসাহিত্যই নয়, জ্ঞানের সংলগ্নতার বোধে, নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞানভাবনা সবদিকেই তাঁর উৎসুক চোখ গিয়ে পড়ে। অমলেন্দু বসু এজন্যই বলেছেন প্রসঙ্গক্রমে, 'তাঁর ছিল জ্ঞানার্জনের বিষয়ে ডনের মতোই "hydroptique thirst" এবং নিজের অধীন আনতে চাইতেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবটুকু না হোক অনেকটাই।'[৩০] বলা বাহুল্য, এই পাঠতৃষ্ণা বা জ্ঞানতৃষ্ণা বা রুচি-অর্জনের তৃষ্ণা তাঁর স্বভাবের ভেতরকার প্রেরণাতেই ঘটেছিল এবং আরও পরে এই সমগ্রতার সন্ধান যথার্থ মুক্তি পেয়েছিল মার্কসবাদের সাযুজ্যে।

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে তিনি 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'বিচিত্রা' কিংবা 'ধূপছায়া' পত্রিকায় লিখে চলেছেন স্বদেশী ও বিদেশী চিত্রকর-ভাস্করদের সম্পর্কে প্রবন্ধ, বিদেশী সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ।

১৯৩১ সালে বেরোয় 'পরিচয়'—সম্পূর্ণ নতুন মেজাজের পত্রিকা—'বাংলা দেশের ক্রাইটেরিঅন'—বুদ্ধির প্রখর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বাইশ বছরের যুবক বিষ্ণু দে এলেন 'পরিচয়'-এর আড্ডায়-প্রায় প্রথম থেকেই। ইতিমধ্যেই অবশ্য 'প্রগতি'-তে

বেশ কিছু এবং 'কল্লোল'-এ সামান্য কয়েকটি লেখা বেরনোর সুবাদে তিনি বোধহয় কিছুটা 'কল্লোল'-এর লেখক বলেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। অন্তত 'কল্লোল'-এর কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা 'পরিচয়'-গোষ্ঠী জানতেন। হিরণকুমার সান্যাল তাই 'পরিচয়'-এর গোড়াকার কথা বলতে গিয়ে লেখেন, 'কল্লোলের পাতায় ও আপাতদৃষ্টিতে কল্লোলী ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন বিষ্ণু-দে'[৩১]– কথাটা অবশ্য ঠিক নয়—কিন্তু বিষ্ণু দে 'কল্লোল' বা কল্লোল-জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গোপন করেন না 'পরিচয়'-এর নবলব্ধ বন্ধুদের কাছে।

কিন্তু 'পরিচয়'-এর জগতই তো তাঁর আরো কাছের। যে আত্মসচেতনতার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর 'ফ্রেঞ্চ ভার্স ফর্ম' নিয়ে, সেই আত্মসচেতন আধুনিকতার সন্ধানই তো 'পরিচয়'-এর লক্ষ্য। কিংবা জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায়, শিল্প-সাহিত্যের নানা জিজ্ঞাসায় বিষ্ণু-দের যে চর্চা ও অভিযান শুরু হয়েছিল, তার পরিগ্রহণ তো ঘটতে পারে এখানেই। কিন্তু 'পরিচয়'-এর একান্ত একজন হয়েও বোধহয় তফাৎ ছিল অন্যদের সঙ্গে—বুদ্ধি ও মননের চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে তার বাইরে মানবজীবনের আঁকাড়া বাস্তবের সৃজনও টানত তাঁকে।

এই পরিগ্রহণের অভিযানে বন্ধু ও শিক্ষকের ভূমিকা ছিল তাঁর কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকের। বিষ্ণু দে বি. এ. পড়েছিলেন সেণ্ট পলস কলেজে (১৯৩০-৩২)। সেণ্ট পলস কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক শুধু তাঁর জ্ঞান-চর্চার পরিধিকেই বিস্তৃত করেন নি, তাঁকে উৎসাহিত করে তুলেছেন সংগীত বিষয়ে, পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়ে। এর মধ্যে দুজনের নাম তিনি কয়েকবারই করেছেন: রেভারেণ্ড সি. সি. মিলফোর্ড এবং অধ্যাপক এইচ. ক্র্যাবট্রি। তবে সবচেয়ে বেশি ছিল ইতিহাসের অধ্যাপক ক্রিস্টোফর একরয়েডের প্রভাব, যিনি তরুণ বিষ্ণু দে-কে, অবশ্যই নিজের মতো করে, চিনিয়েছিলেন আধুনিক ইতিহাস ও মার্কসবাদের জগৎ।[৩২] ইওরোপীয় ক্লাসিকাল সংগীতের প্রতি বিষ্ণু দে-র আকর্ষণও গড়ে ওঠে প্রধানত তাঁর সাহচর্যে। মিলফোর্ড, একরয়েড বা ক্র্যাবট্রি প্রত্যেকেই বিভিন্ন বাজনা বাজাতে জানতেন। কলেজের চ্যাপেলে অর্গানে বাখ বাজিয়ে 'পাশের ঘরের ছাত্রকে চকিত করে' তুলতেন অধ্যাপক ক্র্যাবট্রি।[৩৩] মনে হয়, যে-পাশ্চাত্য সংগীত বিষ্ণু দে-কে সারাজীবন অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল পরবর্তী জীবনে, কবিতা-রচনাকেও প্রভাবিত করেছিল, সেই

সংগীতানুরাগের প্রকৃত শুরু এখান থেকেই। সেণ্ট পলস কলেজের দিনগুলি তাঁর মনের বিকাশে অনুকূল পরিবেশই তৈরি করেছিল। ১৯৩২-এ এখান থেকেই তিনি বি. এ. পাশ করেন, স্বর্ণপদক পান ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তির জন্য।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব এম. এ. পড়তে এসে তিনি ঘনিষ্ঠ হন আরো দুজন বিখ্যাত অধ্যাপকের—একজন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আবেকজন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। এই দুই অধ্যাপক বিষ্ণু দে-কে গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত কবেন (সেই কৃতজ্ঞতাতেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে এবং বহুকাল পবে 'হে বিদেশী ফুল' নামক অনুবাদ-গ্রন্থটি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে)।

'এলিজাবেথান ও শেকসপীয়রীয় বিষয়ে মহাপণ্ডিত' এবং এলিঅট-পাউণ্ড প্রমুখ আধুনিক কবিদের সম্পর্কে খড়্গহস্ত প্রফুল্লচন্দ্র 'প্রত্যেকটি ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত কবতেন এলিজাবেথান উত্তাপ, সে-যুগের কর্মপ্রেরণা ও প্রাণশক্তি'।[৩৪] বিষ্ণু দে তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিছুটা কৌতুকেব সঙ্গেই স্মরণ কবেছেন কিভাবে এলিঅট-সম্পর্কে বিমুখ এই অধ্যাপক এলিঅটের 'পাঠাহত' কপিটি দেখে চমৎকৃত হন ছাত্রের অধ্যবসায়ী কাব্যপাঠের সিবিয়সনেসে। বিষ্ণু দে জানতেন, 'সে উদারতা তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিক্ষক-যশের মধ্যেও ছিল।'[৩৫]

অবশ্য রবীন্দ্রনাবায়ণ ঘোষের সঙ্গে তাঁব মানসিক যোগাযোগ ও মিল ছিল অনেক বেশি। ববীন্দ্রনারায়ণও উঁচুদবের পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর রুচির ব্যাপ্তি ছিল আরো বেশি এবং শুধু শিল্পসাহিত্যই নয়, জীবনযাপন ও বোধেব সমগ্রতার দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। বিষ্ণু দে-র উপর তাঁর গভীর একটা প্রভাব ছিল মনে হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'অন্যদিকে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, যাঁর সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে ইতিহাসে ভূগোলে জ্ঞান ও প্রাণময় আগ্রহ ছিল আশ্চর্য। যাঁর বিষয়ে প্রফুল্লবাবুর মতো কড়া বিচারকও বলতেন: আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতে একমাত্র রবির স্থান আছে নিজেরই রুচিবোধে...। রবিবাবুর আত্মসংকুচিত বিনীত সজ্জন স্বভাব, কিন্তু প্রতিষ্ঠাখ্যাত বহুবিধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে আর অধ্যক্ষজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও এলিঅট-পাউণ্ডদের রচনার বিস্মিত ও নন্দিত পাঠই তার প্রমাণ। রবিবাবুর তখন থেকেই স্থির লেখকের [ বিষ্ণু দে-র ] প্রতি আশ্চর্য স্নেহপ্রীতি ও সাহিত্যিক পরিগ্রহণ ও অনুমোদন। এবং ঐতিহ্য জিজ্ঞাসায় তাঁর জ্ঞান ছিল সহায়।'[৩৬] স্পষ্টতই রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের জীবনের ও দৃষ্টির এই বহুচারিতা—বিশেষত তাঁর

বিশ্বজোড়া আগ্রহ, রুচিবোধ ও ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবির প্রতি স্নেহশীল সংযোগ ও সহমর্মিতা—বিষ্ণু দে-র কাছে ছিল খুবই উপকারী, তাঁর প্রস্তুতিপর্বে সৃজনশীল সহায়ক।

ছাত্রবয়সের এই উত্তাল দিনগুলিতেই (১৯৩২-৩৪) বেরোয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস', লেখা চলতে থাকে 'চোরাবালি'-র বহু কবিতা, 'পরিচয়'-এর আড্ডার সূত্রে লেখা হতে থাকে প্রুস্ত-লরেন্স-হাক্‌স্‌লি-এলিঅট প্রসঙ্গে প্রবন্ধ—চলতে থাকে ছবি দেখা, গান শোনা—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রবল আড্ডা। সেণ্ট পলস কলেজের দিনগুলিতে যে গান-শোনা শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে অর্কেস্ট্রা শুনতে যাওয়া, বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো—দীর্ঘদিনের এই সংগীতচর্চায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কখনো জ্যেষ্ঠ নীরদ সি চৌধুরী বা অপূর্বকুমার চন্দ, বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অনুজ চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বা সমর সেন প্রমুখ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, 'বিষ্ণুর কাছে আমার আরও একটা ঋণ আছে। পাশ্চাত্য সংগীতের রামধনু-আকাশের প্রতি সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিল। /তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে একদিন বিষ্ণুর বাড়িতে একটি রেকর্ড শুনলাম : Thousands Years of Music…/.বন্ধুর বাড়িতেই শুনলাম বেটোফেনের ফিফথ ও সিকসথ সিমফনি।/ · বিষ্ণু একদিন বলল—চলো নীরদদার বাড়িতে যাই। ওঁর কাছে মোৎসার্ট-বেটোফেন-বাখ-এর প্রচুর কালেকশন আছে।/নীরদচন্দ্র চৌধুরী মশাই তখন চক্রবেড়েতে থাকতেন। ·তিনি শুধু রেকর্ডই শোনালেন না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাখ্যাও করে দিলেন।/.. সহোদরপ্রতিম চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুর বাড়ি আসত—আমাদের ঘনিষ্ঠ সহচর, মার্কসপন্থায় বিশ্বাসী উজ্জ্বল তরুণ। তারও ছিল ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রকাণ্ড সংগ্রহ এবং এতৎ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান।/রেকর্ড শুনতে চঞ্চলের বাড়ি যেতাম। প্রত্যেক কমপোজারের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য বিষয়ে আলোচনা হত।'[৩৭] বই-পড়া, গান-শোনা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা-দেওয়া সবই তখন কবিতা-রচনার মালমশলা ও প্রেরণা। সমর সেন যেমন বলেছেন, 'হাতে-তৈরি সেই সূক্ষ্ম গ্রামোফোনটি (ই-এম-জি), তার অদ্ভুতদর্শন চোঙাটিও কবিদের প্রেরণা ও শৃঙ্খলার অঙ্গ ছিল।'[৩৮]

এর পরই একটা বাঁক এসে যায় বিষ্ণু দে-র জীবনে ও সাহিত্যে। অনিবার্য ভাবে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য চর্চার মানস তাঁকে নিয়ে যায় গভীরতর উৎসে। এলিঅট থেকে পাওয়া তাঁর আত্মসচেতনতা ও ঐতিহ্যবোধই তাঁকে প্ররোচিত করে এলিঅট বর্জনে। এই উত্তরণের বিষয়ে পরোক্ষ উক্তিতে নিজের সম্পর্কেই বিষ্ণু দে বললেন: 'একজন তাই থেকে উত্তরোত্তর বুঝতে লাগল যে পথ চওড়া হচ্ছে—সংকীর্ণ অর্থে, প্রাদেশিক অর্থে সাহিত্যসৃষ্টি ও চর্চা থেকে সাহিত্যের উৎসে এবং বহুতায়, ইতিহাসে, জীবনের দর্শনে, জ্ঞানের কর্মিষ্ঠতায়। · দেখল যে অ্যাংলো-ক্যাথলিক রাজন্ত্রবাদী এলিঅটের ঐ ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ নির্ণয়ই নিয়ে যায় সাহিত্যের পাদপীঠে, সমাজ-জীবনে, রাজনীতির ইতিহাসে, অতীতে ও ভবিষ্যতের চিন্তায় অর্থাৎ বর্তমানেই। এবং সাহিত্যিক রূপান্তর হয়ে ওঠে সঠিক রূপান্তরের চৈতন্য।'[২৯]

১৯৩৪ সালে তিনি এম. এ পাশ করেন—১৯৩৫ সাল থেকে শুরু করেন রিপন কলেজের শিক্ষকতা। রিপন কলেজে অধ্যক্ষ তখন তাঁরই প্রিয় শিক্ষক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। সহকর্মী বুদ্ধদেব বসু, যাঁর সঙ্গে 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকার সূত্রে বন্ধুত্ব ছিল নিবিড় এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত তখনই। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা হচ্ছে একে একে। 'চোরাবালি'-র নেতিবাচক ব্যঙ্গবিদ্রূপের জগৎ ছেড়ে এসে তিনি প্রবেশ করছেন সমাজ-সচেতনতার নতুন জগতে। মার্কসবাদে প্রত্যয় কবিতার বিষয়ে ও শরীরে এনে দিচ্ছে নতুনত্ব।

## 'ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পরে'

'বাল্যে রচিত বিষ্ণু দে র ছন্দপটু পদ্য প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কথা উঠেছিল, কিন্তু তার পরে, প্রকৃত তৈরি হওয়ার পর্বে, বিষ্ণু দে-র কাছে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি কেউই নন, অনুসরণীয় ছিলেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কে তাঁর মনে হয়েছিল 'রবীন্দ্রপূর্ব প্রাগৈতিহাসিক'।[১] যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত র 'মরীচিকা'-র 'বিশেষ ভক্ত' হয়েও তিনি বলেছেন, যতীন্দ্রনাথের ঝুড়ির বেতের ফাঁক দিয়ে যে জল গড়িয়ে পড়ে, 'সে জল sentimentalism-এর অশ্রুজল ও সে বেত imagination নয়—fancy।'[২] মোহিতলালের কাব্যের ছদ্ম ধ্রুপদী ভঙ্গির পেছনে যে আসলে রোমান্টিক রুগ্নচিত্ততা আছে, তা বলতে গিয়ে বিষ্ণু দে লিখলেন, '"ইনটেন্‌স্‌লি feel করিতে" গেলে যে চিত্তবৃত্তির স্বাস্থ্য ও সতেজতা চাই, তাহা রুগ্নচিত্ততার বিরোধী।'[৩]

অবশ্য একই সঙ্গে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিও বিষ্ণু দে-র গভীর একটা

আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল—বিশেষত 'কল্লোল'-এর কোনো কোনো লেখকের প্রতি। একই সময়ে যখন তিনি সাহিত্যে 'মনের প্রাধান্য' বিষয়ে সোচ্চার, রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতি বিদ্রূপপ্রবণ, তখন 'কল্লোল'-সম্পর্কে তাঁর এই দুর্বলতার কারণ সম্ভবত এটাই যে, তাঁর মনে হয়েছিল, কৃত্রিম সৌন্দর্যপনার বিরুদ্ধে এই সজীব ভাঙচোর কোনো-এক ভাবে হয়তো আঁকাড়া জীবনকে ছুঁতে পেরেছিল। তাই তো 'কল্লোল'-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'বেদে' পড়ে বিষ্ণু দে মুগ্ধ চিঠি পাঠান কবিতার আবেগে: 'হৃদয়ের মাঝে আছে যে গোপন বেদে/অদ্ভুত তার বিচিত্র কিবা ভাষা…।'[৪] 'কল্লোল'-এর কোনো কোনো লেখকের প্রতি তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা এবং ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় যুগে তাঁর কয়েকটি কবিতাও বেরোতে থাকে ঐ পত্রিকারই পাতায়। তার মধ্যে ছিল খলিল জিব্রান-এর 'আরব কবিতার'-র অনুবাদ 'উন্মাদ-বইটির ভূমিকা।[৫] এর ফলে পরবর্তীকালে যখন তিনি 'পরিচয়'-এর আড্ডায় প্রবেশ করলেন, তখন এ-ঘটনাও তাঁর সম্পর্কে ছিল: 'কল্লোলের যুগের অর্বাচীনতম কবি বিষ্ণু দে।'[৬]

এ-কথা যে মোটেই সত্য নয় তা বোঝা যায়, যখন আমরা তার প্রায় সমসাময়িককালের প্রবন্ধেই পড়ি 'কল্লোল'-যুগের জলো রোমান্টিকতার বিষয়ে তাঁর ঠাট্টাবিদ্রূপ। 'দেশবিদেশের ইমোশ্যনাল একসাইট্‌মেন্ট' সম্পর্কে ব্যঙ্গবান ছোঁড়েন, 'কল্লোল'-এর প্রথিতযশা লেখক সম্পর্কে বলেন, 'বুদ্ধদেব বসু হয়তো intensely feel করিয়াই "বন্দীর বন্দনা" বা "পাপী" লেখেন, কিন্তু তিনি তো সকল কবির প্রতিনিধি নন। হৃদয়কেই বল্লভ সকল কবিই করেন না।' প্রমথ চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'আমাদের ক্যালচার য়ুরোপের ছাড়া কাপড় নিয়ে'[৭] কিংবা এই সময়ে অন্যত্র লেখেন, 'আমরা ভুলে গেলুম যে স্থূলতা ও বর্বরতাই জীবন নয়। এবং বাস্তব ও বাস্তবতায় প্রভেদ আছে।'[৮] সাহিত্যের রুচি বা সাহিত্যিক সমালোচনা কীভাবে 'ব্যক্তিবাদে'র দ্বারা, শুচিবায়ুগ্রস্ততার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তা উদ্ঘাটিত করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেন তিনি 'প্রগতি'-র পাতায়: 'মন হয়তো খারাপ থাকে, বাদলের সন্ধ্যায় বসে বসে হয়তো রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়ি। লিখতে শুরু করি, "উর্বশী"-র চেয়ে "বর্ষার দিনে" কত ভালো।…কারণ আমাদের মতামত ব্যক্তিগত। বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো সেগুলো চিরন্তন নয়।'[৯]

এই ব্যক্তিবাদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তাই তিনি অনিবার্যভাবেই এসে দাঁড়ালেন প্রমথ চৌধুরীর পাশে। রবীন্দ্রনাথের এত ঘনিষ্ঠ, পারিবারিক

আত্মীয়তায় এবং বুদ্ধি ও আবেগের সহধর্মিতায়, কিন্তু তবু গদ্যে ও কবিতায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত এই লেখকই তাঁর কাছে সবচেয়ে কাছের লোক মনে হয়েছিল এই শিক্ষানবিশী পর্বে। শৈশবের 'ছন্দমিলের পালাকীর্তন' শেষ করে, প্রায় দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্যের' খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তিনি প্রথম যখন লেখা ছাপাতে শুরু করলেন তখন তাঁর নিজেরই হিসেব অনুসারে বয়স 'তেরো বা চোদ্দ বছর'—অর্থাৎ ধরা যায় ১৯২৩-২৪ সাল। আমাদের হাতের কাছে অবশ্য সবচেয়ে পুরনো রচনাকাল যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তা ১৯২৫—'চোরবালি' গ্রন্থে প্রকাশিত 'গার্হস্থ্যাশ্রম' কবিতার অন্তত কিছু কিছু অংশ নিশ্চয়ই ১৯২৫ থেকেই রচিত হতে শুরু করে, কেননা ঐ গ্রন্থতেই কবিতাটির রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯২৫-৩০। কিংবা পরের যে কবিতাটিব তারিখ পাওয়া যায়, সেই ১৯২৬ সালে রচিত 'আধুনিক প্রেম', ছাপা হয় ১৯২৯ সালে 'প্রগতি' পত্রিকায়।

কিন্তু ব্যাপকতরভাবে তাঁর লেখা ছাপা হতে শুরু কবে ১৯২৮ সাল থেকে —প্রধানত চাবটি পত্রিকায: 'বিচিত্রা', 'প্রগতি', 'ধূপছাযা' এবং 'কল্লোল'। এব মধ্যে 'কল্লোল' পুবনো পত্রিকা, কিন্তু 'বিচিত্রা'-'প্রগতি'-'ধূপছায়া' প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক বছব আগে থেকে—অর্থাৎ সব কটিরই প্রথম সংখ্যা বেবোয় ১৯২৭ সালে ( বাংলা ১৩৩৪ )। 'প্রগতি' ঢাকার পুবানা পল্টন থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় এবং 'ধূপছায়া' কলকাতা থেকে বেণুভূষণ গাঙ্গুলি ও অরিন্দম বসু-র সম্পাদনায বেরোতে থাকে। দুটি পত্রিকাই, সর্বতোভাবে, সাহিত্যে যে আধুনিকতার 'আন্দোলন' শুরু হয়েছিল 'কল্লোল'-'কালিকলম'-এর নামে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল সহযাত্রী হিসেবে। যদিও বিষ্ণু দে খানিকটা নিবিড়ভাবেই যুক্ত ছিলেন পত্রিকা দুটির সঙ্গে—তবু সাহিত্যিক রুচি ও মতামতের মৌলিক পার্থক্যের কাবণেই পত্রিকা দুটিতে বিষ্ণু দে-র গদ্য ( এবং কবিতা) ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়েছে তাঁর সঙ্গে সম্পাদকীয় মতভেদ। বিশেষ কবে প্রায় প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার আবহতেই যে মতভেদের সূত্রপাত হয়েছিল, তার পেছনে যে মৌলিক নন্দনতত্ত্বের ভেদ দায়ী ছিল. তা আমরা আজ সহজেই বুঝতে পারি।[১০] 'প্রগতি' ও 'ধূপছায়া' উভয় পত্রিকাতেই উগ্র যদিচ তরল রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রতিবাদ যেমন তিনি করেছেন ( মূলত লক্ষ্য ছিল বুদ্ধদেব বসুরই রবীন্দ্রবিরোধিতা ), তেমনি ঐসব পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে-আসার চিহ্ন সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল বিষ্ণু দে-রই কাব্যভাষায়।

১৯২৮ এবং ১৯২৯ এই দুই বছরে পূর্বোক্ত পত্রিকা চারটিতে বিষ্ণু দে-র কয়েকটি প্রবন্ধ, বেশ কয়েকটি গল্প এবং কবিতা বেরোতে থাকে। বিষ্ণু দে-র গড়ে-ওঠার ইতিহাসে এটাকে প্রথম ধাপ বলা যায়। কবিতাগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষণীয় যা তা হল, প্রায় প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ফরাসী রীতির বিন্যাসে লেখা—শিরোনামের তলায় বন্ধনীমধ্যে লেখা 'ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত', 'Ballade ছন্দে', সর্বাধিক ক্ষেত্রে 'Triolet' এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে 'Rondelet'। স্বভাবতই সকলের মনে পড়ে যাবে প্রমথ চৌধুরীর কাব্য-প্রচেষ্টার কথা। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা বা আদর্শেই যে এই বিভিন্ন ফরাসী 'ছন্দে' কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন বিষ্ণু দে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু কবিতা নয়, ঠিক এসময়েই রচিত তাঁর গল্পগুলিও প্রমথ চৌধুরীর প্রতি তাঁর সাহিত্যিক অনুরাগেরই ফসল। কিন্তু এ তো স্বেচ্ছাচারী কোনো নির্বাচন নয়—রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে আত্ম-আবিষ্কারের পথে এ এক জরুরি অনুশীলন।

কেননা সেকালে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবই ছিল, অন্তত কাব্যরচনার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর কাব্যরচনার পদ্ধতিই ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে ভিন্ন। তিনি নিজেই বলেছেন 'সনেট পঞ্চাশৎ'-সম্পর্কে: 'আমার সনেট যদি কবিতা হয় তাহলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী।'[১১] কিংবা অন্যত্র: 'রবীন্দ্রনাথের lyric মূলত গীতধর্মী—তার flow অসাধারণ। সনেট আমার মতে sculpture-ধর্মী—এর ভিতর উদ্দাম flow নেই।' এই 'উদ্দাম flow'-এর বিরোধিতাতেই প্রথম চৌধুরীর কাব্য রচনা। তিনি কোন পরিস্থিতিতে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-অনুকরণের সেই পরিবেশের কথাই তুলে ধরেছেন—'রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম।' স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তারিফ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর 'নির্মমভাবে নিখুঁত' কবিতার, যে কবিতা তাঁর মতে 'বাংলার সরস্বতীর বীণায়' 'ইস্পাতের তার'। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, 'সনেট পঞ্চাশতের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, হয়তো রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতিপ্রাবল্যের ব্যতিক্রম বলেই।'

ঠিক কোথায় প্রমথ চৌধুরী আলাদা হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে? প্রমথ চৌধুরীর নিজের কথাতেই শোনা যাক এর ব্যাখ্যা: 'রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotion-ই হয়তো আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা

experiment হিসেবে।...আমার সনেটের অন্তরে হয়তো art-এর চাইতে artificiality বেশি। তাই আবেগের বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতার লক্ষ্য নয়, তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষ্য অবয়ব গঠন, রূপ বা ফর্মের সাধনা। তিনি তাই ফরাসী কাব্যের রূপচর্চাকে আনতে চাইলেন বাংলায়—Triolet, Terza Rima প্রভৃতি রূপাবয়বে। আসলে কৃত্রিম পরিশ্রমী কাব্যরচনার মধ্য দিয়েই ভাঙতে চাইলেন 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকলে'র আবেশ।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার সাফল্যের সীমা শেষপর্যন্ত যতটুকুই হোক, তাঁর এই 'সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী' কাব্যপ্রয়াস বিষ্ণু দে-র মতো পরবর্তী আধুনিক কবিদের শিক্ষাস্থল—তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক পথপরিক্রমা করতে গিয়ে যে আত্ম-সচেতনতাকে আশ্রয় করেছিলেন, সেই আত্মসচেতনতারই সূত্রপাত প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে। 'ভাবালুতার বিস্রস্ত আত্মপ্রকাশের প্রাবল্যের কালে সংযম ও নৈপুণ্যের আশ্চর্য যে-দৃষ্টান্ত একদা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেজন্য উত্তরকালীন কবিরা—যাঁরা স্বভাবকবিত্বে নয়, সচেতন শিল্পকর্মে বিশ্বাসী—এই পূর্বসূরীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এই আশা পোষণ করা যেতে পারে।'[১২] বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যানুশীলন এই কৃতজ্ঞতারই দৃষ্টান্ত।

অল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী 'ভিলানেল', 'বালাদ' ও 'ট্রিওলেট' ছন্দে পরপর যে কবিতা কয়েকটি তিনি লিখেছিলেন, তা আজ পুরনো সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বিলুপ্ত হওয়ার অপেক্ষাতেই মাত্র রয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে এর মধ্য থেকে তিনটি সম্পূর্ণ কবিতা এবং দুটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করলে পাঠকেরা বিষ্ণু দে-র এই অনুশীলন-পর্বের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ পেতে পারেন, যদিও কবি স্বয়ং এই কবিতাগুলির উল্লেখেই লজ্জিত হতেন।[১৩]

স্মৃতি

(ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত)

বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি
তিমির কালো ঘোমটা খুলি এসেছ মনে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

মনে যে আসে প্রেমের আলো নয়নে ধরি,
আধেকফুট কথা ও লীলা অধর কোণে,—
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

কাব্য পড়ি সন্ধ্যা যেত গল্প করি—
মাথাটী বুকে চাহিতে মুখে ক্ষণে ক্ষণে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

বরষা বাতে তন্ত্রী পবে টানিতে ছড়ি—
গুমরে সুব বাদলহাওয়া মেঘের স্বনে,
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

স্নিগ্ধশ্রী ও তনুটী ঘেরি নীলাম্বরি,
গৃহেব কাজে ব্যস্ত—শুন, পড়িছে মনে—
দেখিযাছিনু তোমাবে মোব এ ঘব ভবি।

মূবতি নাই, স্মৃতি যে শুধু বহিল পডি
ঘুবিছে কত কথা ও ছবি মনেব বনে।
বিজন ঘবে নিভৃত বাতে তোমাবে স্মবি—
দেখিযাছিনু তোমারে মোব এ ঘব ভবি॥

( 'বিচিত্রা', ফাল্গুন ১৩৩৪ ব. ১৯২৮। পৃ ৪১০ )

গাঁয়ের চিঠি

( Ballade ছন্দে )

শবৎ আসে ববত পবে শবৎ দেখি আসে!
শরৎশ্রীতে শ্রী ধবি মাটি, আকাশ মনে টানে!
ভাদ্রপ্রীতি আদর পেযে গববে তটী হাসে
স্বর্ণআভা বিচ্ছুরিছে আধেক সোনা ধানে,
ক্ষেতসুবাস মিঠা কী মেঠো গন্ধ আসে ঘ্রাণে,
আকাশ নীল, শ্যামল মাটি ববষারসে ভরি;—
পুলকে মোর সর্বমন চাহিছে তোমা পানে—
কোথায় তুমি একেলা সখী সহরে আছ পডি!
শরৎশ্রী কী ফুটেছে শ্বেতমেঘে ও শ্বেতকাশে!

মেয়েরা ঐ কলস লয়ে চলেছে সব স্নানে,
রাখাল তার গরুর পাল বিচিত্র কী ভাষে
চালায একা !—শব্দ তার আসিছে ভাসি কানে···

[ এর পর আরো ষোল লাইন আছে ]

( 'প্রগতি', কার্তিক ১৩৩৫ ব, ১৯২৮। পৃ ২৯৯ )

## তেপাটী

( Triolet )

সন্ধ্যাব শ্যাম অন্ধকারে
বাতাযনে তুমি দাঁড়াযে সখী !
ধূসর মলিন আকাশ পারে
সন্ধ্যাব শ্যাম অন্ধকাবে
যে মাযা হেবিছ, কেমন তাবে
ধবিলে বয়ানে ? কও ? ভাবো কি,
সন্ধ্যাব শ্যাম অন্ধকাবে
বাতাযনে তুমি দাঁড়াযে, সখী।

[ এবকম ৬টি অংশের একটি ]

( 'কল্লোল', ভাদ্র ১৩৩৬ ব, ১৯২৯। পৃ ২৮১ )

## বিদুষী

Austin Dobson-এব অনুসরণে

( Triolet )

প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী,
বারে-বারে ডাক পড়ে মোব যখন-তখন অন্দরেতে !
স্থানের বিচার ত্যাগ করে তাঁর চুড়িব ডাকা রিনিঝিনি—
প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী !
—পান নেবে না ? চুরুট ? নভেল ?—সকল ছলায় জ্ঞান গৃহিনী।

সেই কারণেই বাপের বাড়ী মাঝে মাঝে চান যে যেতে।
প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী।
বারে-বারে ডাক পড়ে মোর যখন-তখন অন্দরেতে।
( 'প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬ ব, ১৯২৯। পৃ ৫৬।

ভারতচন্দ্র
( Rondelet )

রায় গুণাকর !
ভাষার প্রদীপে রঙীন দীপালি জ্বালো!
রায় গুণাকর !
বিদ্যা ও উমা সুন্দর ও শিব নাগরী নাগর !
তীক্ষ্ণ তোমার বিদ্রূপে করো সবারে কালো!
ব্যঙ্গ কি খাসা! কি খাসা ভাষায় সবেতে ঢালো?
রায় গুণাকর ! ( ঐ )

এ ছাড়া এসময়ে তিনি আরো অনেক ট্রিওলেট লিখেছেন, নৈপুণ্যের দিক থেকে সেগুলো বোধহয় আরো পরিপক্ক—অধিকাংশই বেরিয়েছে 'প্রগতি' পত্রিকায়। পরে 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে সেগুলো সাজানো হয়েছে নানা বিন্যাসে—যেমন 'গার্হস্থ্যাশ্রম' বা 'শিখণ্ডীর গান'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ট্রিওলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না রেখে যে-ভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ করেছেন [ কবি ] তাতে প্রচুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।'[১৪]

আসলে ঠিক এই সময়ে তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়েছিল 'ট্রিওলেট'—বোধহয় বহিরঙ্গ রূপসাধনা বা টেকনিকের চর্চা যা বিষ্ণু দে করতে চেয়েছিলেন রোমান্টিক-বিরোধী, প্রেরণাবেগ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায়, তার পক্ষে চমৎকার বাহন ছিল এই ট্রিওলেট। প্রমথ চৌধুরীরও প্রিয় ফর্ম এই ট্রিওলেট। বিষ্ণু দে এর অনুবাদ হিসেবে 'তেপাটী' নামটিও গ্রহণ করেন প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরীর কথায়: 'ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটিছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটী। সে-সকল তেপাটীতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত দুই জমির

ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরত করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটী লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরত।' বা অন্যত্র বলেছেন: 'Triolet লেখাও কঠিন—তার পুনরুক্তির জন্য।' ভাবোচ্ছ্বাসের 'কবিআনা ঢঙ' যখন প্রবল হয়েছিল, তখন লেখনীর এই 'কসরত'ই ছিল প্রতিবাদের ভাষা—বিষ্ণু দে-র কাছেও। পরন্তু 'ভাবঘন' গুরুভার কবিতার পাশে ব্যঙ্গের হালকা ছটা, বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি আনতে হলেও ফরাসী মেজাজের এই সব চাল খুব কাজের হয়—'বলা বাহুল্য এ কবিতার [ ট্রিওলেটের ] ভাব-ভাষা দুই-ই নেহাত হালকা হওয়া চাই।'[১৬] ঠিক এই সময়েই বিষ্ণু দে বেশ কতকগুলো গল্প লেখেন—প্রথম চৌধুরীরই আদলে। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি গল্পের ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর মননশীল ব্যঙ্গপ্রধান 'স্টাইল' আধুনিক আত্ম-সচেতন মনের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। সম্ভবত প্রথম যে গল্পটি লেখেন, তা হচ্ছে ১৯২৮ সালে 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত 'পুরাণের পুনর্জন্ম/লক্ষ্মণ'। এ গল্পটি রচনায় একটি ইতিহাস আছে। '"প্রগতি"তে তখন "পুরাণের নবজন্ম" লেখা হচ্ছে—হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে রামায়ণের পুনর্লেখন। প্রভু গুহঠাকুরতাই সে লেখার উদ্বোধন করেছেন। তারই অনুসরণে বিষ্ণু [দে] "কল্লোলে" "পৌরাণিক প্রশাখা" লিখলেন—ভরতকে নিয়ে।'[১৭] এই তথ্য-পরিবেশনের মধ্যে একটু বিভ্রান্তি আছে। 'কল্লোল'-এ ভরত-বিষয়ক রচনাটি বের হয় ১৯২৯ সালে—তার প্রায় দু-বছর আগে, 'প্রগতি'তেই বিষ্ণু দে-র প্রথম গল্পটি বেরোয়। বস্তুত ঐ বছরই 'প্রগতি'র শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল বিপ্রদাস মিত্রের ( বুদ্ধদেব বসুর ছদ্মনাম ) লেখা 'পুরাণের পুনর্জন্ম/উর্মিলা'। ওটাতে মূল বিষয় ছিল উর্মিলার জীবনের ব্যর্থতা—বলা বাহুল্য 'হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে'। সেটা পড়ে বিষ্ণু দে খুব 'খুশি' হন, বিশেষত এর 'লেখার কায়দায়'। এ-বিষয়ে কবিপত্নীর জবানিতে লেখা ( প্রথম বন্ধনীর মধ্যে কবির মন্তব্যসহ ) একটি চিঠি থেকে আরো তথ্য উদ্ধার করি: 'প্রগতিতে প্রভু গুহঠাকুরতা "পুরাণের পুনর্জন্ম" বলে একটা স্মার্ট গল্প লেখেন। বোধহয় John Erskine-এর গল্প অবলম্বনে। প্রাচীন গল্প হেলেন অব ট্রয়ের আধুনিক রূপান্তর। বুদ্ধদেববাবুর উৎসাহে সেই বইখানি Book Co. থেকে কেনেন। তখন [ বিষ্ণু দে-র ] বয়স খুব অল্প—হয় কলেজে উঠবেন বা উঠেছেন সবে। তাতে ওঁর মজা লাগলো, এবং উনি একটু burlesque style-এ sequel একটা লেখেন। সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে, ৪৭নং পুরানা পল্টনে, প্রগতির আপিস এবং ওঁর বাড়িও। তখন ঢাকায়

মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন, বাংলার লেকচারার হয়ে। তিনি নাকি ভেবেছিলেন ( "of all men" ! ) প্রমথ চৌধুরী বেনামে লিখছেন ! ( "আমি খুব খুশি হয়েছিলুম, কারণ সবুজপত্রের বিখ্যাত প্রমথ চৌধুরীর smartness আমাদের তখন খুব ভালো লাগত" )।[১৭]

এরকম 'কায়দা'-র লেখা থেকে বিষ্ণু দে-র তৎকালীন ভাবনার কোনো ছাপ আবিষ্কার করা নিশ্চয়ই অবাস্তব হবে, কিন্তু লক্ষণীয় এটুকুই যে উর্মিলার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে গিয়ে বিপ্রদাস মিত্রের লেখায় লক্ষ্মণের চরিত্রের যে সরলীকরণ করা হয়েছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করে তিনি চরিত্রের নিহিত জটিলতা, হয়তো বলা যায় আধুনিক জটিলতা বানিয়ে তুললেন। কিংবা—ধরা যাক গল্পটিতে 'লক্ষ্মণের খাতা' অংশে কোনো পাঠক যখন পড়েন, 'সীতা ত সে প্যানপেনে আহ্নিকালের সীতা নয়—এমনকি ভীরুকোমল শকুন্তলাও ত নয়—সে হচ্ছে পরিপূর্ণ সুন্দরী, মোহিনী' এবং তার সঙ্গে আরো পড়েন, 'সীতার সঙ্গে ( লক্ষ্মণের ) মতে মিল্‌ল, অর্থাৎ ফরাসী সাহিত্যের তিনি ভক্ত—এবং সরস cynicism ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—তা সে ভল্‌তেয়ার, কি সুইফ্‌ট্‌ কি ব্যাবেলে কি ওয়াইল্ড বা শ-রই হোক্ না'[১৮]—তখন সেই পাঠকের মনে হতেও পারে বিষ্ণু দে-র গদ্যে, গল্পের গদ্যে তো বটেই, শুধু ইংরেজি অন্বয়রীতিই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীরভাবে শিক্ষিত নাগরিক কথা-বলার ধরনটাও প্রত্যক্ষগোচর। শেষপর্যন্ত অবশ্য দাঁড়িয়ে যায় এর লেখার 'কায়দাটা'-ই, এবং কায়দা-র স্বকীয়তা, যা শুধুমাত্র প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের নিরিখেই দেখা চলে না। ১৯২৯ সালে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'ভরতকে নিয়ে' লেখা 'পৌরাণিক প্রশাখা' গল্পটিতেও যেমন, প্রমথ চৌধুরীর 'smartness' তো আছেই, আরও অতিরিক্ত কিছু আছে।

এছাড়াও আরো কতকগুলি গল্প তিনি লিখেছেন—'প্রগতি'-র পাতায় ( ৪টি ) ও 'ধূপছায়া'তে ( ১টি )। এ-সম্পর্কে তিনি নিজে লেখেন : 'গল্পগুলি বাজে। লজ্জাকরভাবে বাজে'।[১৯] বিষ্ণু দে-র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে লেখা এই গল্পগুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন আজ অবান্তর—কিন্তু আমাদের কাছে এগুলোর বেশি গুরুত্ব ঐতিহাসিক কারণে, লেখকের তৈরি-হওয়ার সময়ে মনের গড়নের বিচারে। গল্পগুলি প্রত্যেকটিই বিদ্রূপাত্মক ও ব্যঙ্গমূলক। এই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য কখনো শহুরে 'আধুনিক' প্রেমের কৃত্রিম রোমান্টিক ভাবালুতা ('ফিরে-ফিরতি' ), বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীর ও বিরহিণী স্ত্রীর ঈর্ষা-সন্দেহ-শয্যামিলনের হৃদয়বিলাস ( 'বাসররাত্রি' ), কখনো-বা একই সঙ্গে স্থূলরুচি ও সূক্ষ্মরুচি উভয় বন্ধুই ('বন্ধু')

কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ হিরো ( 'হিরো' )।[২০] অধিকাংশ গল্পই রচনাবিন্যাসে ও ভঙ্গিতে প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করায়—তাঁর গল্পের মতোই আড্ডার সূত্রে কাহিনীর উন্মোচন।

বিষ্ণু দে-র লেখা এ সময়কার কবিতা বা প্রবন্ধের সঙ্গে এই গল্পগুলির মেজাজ যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি এগুলোর আশ্রয়েও আত্মসচেতনতাব অভিযান এগোচ্ছে এমন বলা যায়।

১৯২৮ সালে 'ধূপছায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'ই বোধহয় বিষ্ণু দে-র প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ—অন্তত এর পূর্বে ছাপা কোনো প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পাই নি। পত্রাকাবে লিখিত এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিষ্ণু দে বলেছেন, 'সে সময়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির বিষযে "শ্যামল রায়" নামে একটা অসাড প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে একটা কথা ছিল, আমার মনে আছে যে, ইঁট দিযে বাড়ি তৈরি করলে plaster দিলে solid বাড়ি তৈবি হবে, গগনবাবুর cubist ছবি two dimensional, যেন টালি দিযে বাড়ির দেয়াল তৈরি করা—তার তো আর plasterএর প্রয়োজন নেই। আলোছায়ার খেলা।—তার আগেই cubist ছবি Europe-এ আবস্ত হয়ে গেছে। ধূপছাযার সম্পাদক একদিন জানালেন যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিযেণ্টাল আর্ট তিন copy ঐ পত্রিকা সমবায় ম্যানসনে পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন, ওঁবা দাম দিয়ে কিনে নেবেন, সেখানে গগনেন্দ্রনাথের exhibition হবে।...পর পর বোধহয় তিন পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি নাকি খুলে বেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মগ্লানিতে আমার আর exhibition-এ যাওয়া হল না।'[২১]

গগনেন্দ্রনাথ-বিষয়ে এই প্রবন্ধটি ছাড়াও এক বছরের মধ্যেই বিষ্ণু দে শিল্প-বিষয়ে আবো দিকনির্দেশক প্রবন্ধ লেখেন—এবাব বিদেশী চিত্র ও ভাস্কর্য সম্পর্কে। শিল্পবিষয়ক আলোচনায় বিষ্ণু দে-র যে আগ্রহ ও অধিকার পরবর্তী-কালে আমরা দেখেছি, তার সূত্রপাত তখন থেকেই। শিল্পী-নির্বাচনে এবং শিল্পীর গুণাবলির বর্ণনায় বা মাত্রারোপে বিষ্ণু দে-র অখণ্ড ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ ছিল তখনও। সে দিক থেকেও স্মরণীয় এই অল্পবয়সের প্রবন্ধগুলি। গগনেন্দ্রনাথ-বিষয়ে যে বিষ্ণু দে লেখেন, 'গগনবাবুর ছবি পুরো বাংলার ছবি।...য়ুরোপের কিউবিস্টরা শুধু স্থিতিশীল পদার্থের ছবিই আঁকতে পারতেন। কিন্তু গগনবাবু কিউবিসমে গতি ফোটাতে পারেন। ধরো য়ুরোপীয

কিউবিস্ট যেন আঁকেন নিশ্চল বাড়ির ছবি—গগনবাবু তার ওপর গতিশীল মেঘও ফোটাতে পারেন'[২২] —তিনিই 'বিচিত্রা'-র চিত্রসংবলিত সুদৃশ্য প্রবন্ধে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী লরেন্‌স্‌ য়্যাটকিন্‌সন্‌ সম্পর্কে লেখেন, 'প্রশ্নব্যাকুল গভীর-চিত্ত য়্যাটকিন্‌সন্‌ সারা য়ুরোপের চিত্রশালাসমূহ ঘুরেছেন, বড় বড় আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ করেছেন। জীবনের রহস্যে মুগ্ধ হয়ে কত নরনারীর সঙ্গে মিশেছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য তাঁর পাঠ্যবিষয়। নিজে তিনি কবিতাও রচনা করেছেন, আর তাঁর জীবনব্যাপী আর একটা সাধনা আছে, সেটি হচ্ছে সংগীত। য়্যাটকিন্‌সনের শিক্ষা ব্যাপক। তিনি শুধু সাধারণ শিল্পার্থীর মতো ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তেই শেখেন নি। য়্যাট্‌কিন্‌সনের শিল্প তাই গভীরতার ভক্ত। তাই তিনি কোনো বিশেষ দলের নন। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে।'[২৩] কিংবা একই পত্রিকায় একই বছর ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী অগস্টস্‌ জন্‌ সম্পর্কে: 'অগস্টস্‌ জনের স্বভাব এক সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব। তিনি ভালোবাসতে পারেন। এবং যে শিল্পসৃষ্টি তাঁর ভালো লাগে, তার বৈশিষ্ট্য তাঁর মন আপন করে নেয়।...জীবনে যে কারণে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক, শিল্পেও তাঁর সেই প্রবল প্রাণশক্তি তাঁর শিল্পকে শিল্পের জগতে বিশেষ স্থান দিয়েছে।...এবং অগস্টস্‌ জনের প্রাণের উচ্ছলতা তাই সার্জেন্টের মতো সোসাইটিতে তৃপ্তি পায় না। তাই তাঁর চিত্রে জিপ্‌সির বারংবার আবির্ভাব।'[২৪] এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে চিত্র-ভাস্কর্য সংগীত ইত্যাদি শিল্পের নানা বিষয়ে চর্চা ও জিজ্ঞাসু আগ্রহই প্রমাণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তুয়মান নন্দনতত্ত্বের কাঠামোটিরও যেন আভাস পাওয়া যায়।

ঠিক তেমনি সমসাময়িক কালে রচিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও অনুবাদও তাঁর রুচির এই জগতকে নির্দেশ করে। কবিতারচনায় রবীন্দ্রবর্জন ঐতিহাসিক বা শিল্পগত কারণে যাঁর কাছে অনিবার্য, তিনিই কিন্তু অবিচল মাত্রাজ্ঞানে স্থূল, রবীন্দ্রবিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদী। তাই 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখক হয়েও তিনি সাড়া দিতে পারেন না 'প্রগতি'তে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধের উগ্রতায়—'আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য" রচনা করেন। সাহিত্যের কষ্টিপাথর কি হওয়া উচিত, তাহা এই রচনা পাঠে অতি স্থূলবুদ্ধিও জানিতে পারে। (শ্রাবণের "প্রগতি"তে) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এ রচনা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া না বুঝিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া স্থানকালপাত্র ভুলিয়া খুব জোরালো ভাষা ব্যবহার করিয়া বসিয়াছেন।...

রবীন্দ্রনাথ যে "রূপ" বলিতে রচনার সমগ্র বিশেষত্ব formটি বোঝাইতেছেন সেটুকু বুঝিলে মন্মথবাবু একথা বলিতেন না এবং এ বুদ্ধিহীন রসিকতাও করিতেন না।'[২৫] কিংবা : 'যখন বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট, তখন কথাটি শুধু ঐটুকুমাত্র নয়। তার সঙ্গে জড়িত আছে বক্তার বা লেখকের মনস্তত্ত্ব – বলার উদ্দেশ্য বা ব্যক্তির মন বা temperament। যেমন জড়িত থাকে যখন কেউ বলেন, "যোগাযোগ" আশ্চর্য সংযত রচনা।... তুলনামূলক সমালোচনা তাই ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথকে বড় কি ছোট বা খারাপ কি ভালো সে কথা অন্যের সম্বন্ধে আলোচনায় তোলা স্থিতধীর পরিচয় নয়।'[২৬] দুটি রচনাই 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনার প্রতিবাদ—এবং বাদপ্রতিবাদ এই সূত্রে আরো চলেছিল।[২৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শিল্পসাহিত্যের নানা বিষয়ের আলোচনায় ও বিতর্কে ক্রমশ বিষ্ণু দে নিজের মননকে শানিত করে তুলছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বৈদগ্ধ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের সামগ্রী হয়ে উঠছে।

এর পর 'পরিচয়'-এর আবহাওয়ায় বিদেশী সাহিত্যের পঠনপাঠনের পরিধি গেল বেড়ে। তার কারণ এই বিদেশী সাহিত্যের চর্চার মধ্যেই বাঙালি লেখকেরা আধুনিকতার ইশারা পেয়েছিলেন—তাঁদের নিজেদের পরিবেশে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন এর বাস্তবতা। এলিঅট তো সর্বপ্রথম – কারণ তাঁকে আবিষ্কারের সূত্রেই সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। একে একে এসে গেলেন তাঁর মনোযোগ ও চর্চার সীমানায় মার্সেল প্রুস্ত, ডি. এইচ্. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্ফ্-এর গদ্য, আই এ. রিচার্ডসের সমালোচনা কিংবা পাউণ্ডের কবিতা। বিষ্ণু দে বলেন, 'এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস। আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফকায়, পাস্টেরনাকে, খানিকটা ভার্জিনিয়া উল্ফে।'[২৮]

অতএব 'পরিচয়'-র ১ম সংখ্যায় (১৯৩১) বেরোল তাঁর কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মার্সেল প্রুস্তের অনুবাদ—'প্রুস্তের আটভাগে প্রকাশিত "অতীতের অন্বেষণে" নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে এ কয় পৃষ্ঠা নেওয়া।'[২৯] ঐ একই বছরে (এবং দু-বছর পরে আবার) বেরোল ডি. এইচ্. লরেন্স সম্পর্কে তাঁর সানুরাগ শ্রদ্ধা—'তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত যে প্রাণ তার আগুন'-এর অনুভব। অলডাস হাক্স্লি বা রোনাল্ড বট্র্যাল বা অডেন গ্রেগরি পার্স্ন্স্ এবং বিশেষ

ভাবে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ সম্পর্কে পুস্তক-সমালোচনা লেখেন 'পরিচয়'-এর পাতায় পর পর। এলিঅট-সম্পর্কে তাঁর প্রথম আলোচনা বেরোয় বোধহয় ১৯৩২ সালে এবং ১৯৩১ সালে 'দি রক' ও 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর বিষয়ে আলোচনা। এজ্রা পাউণ্ড এবং আই. এ. রিচার্ডসও সমালোচিত হয়েছেন ১৯৩৪-৩৫ সালে।[৩০]

এই পরিবেশ-বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, একদিকে পশ্চিমী নিত্যনতুন তীব্র আঙ্গিকসাধনার মধ্যে যেমন বিষ্ণু দে খুঁজে নিতে চান আত্মপরিচয়—বুর্জোয়া আঘাতের উত্তরে ভঙ্গুরতার বা বিচ্ছিন্নতার আত্মসচেতন প্রত্যাঘাতে—তেমনি অন্যদিকে বিষয়নিষ্ঠা বা আবেগনিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পেতে চান খণ্ডচৈতন্যের যন্ত্রণাবোধ।

কিন্তু এই আঙ্গিক-চেতনা ও যন্ত্রণাবোধ বা বিচ্ছিন্নের বোধ আসল রূপ পায় এ.সময়কার কবিতা-রচনায়। ব্যঙ্গে, কখনো আত্মসচেতন আবেগ অনুভূতির উল্লাসে বা কখনো একাকীত্বের তীব্র বেদনাবোধে কবিতাগুলো পরিকীর্ণ। অভিজ্ঞতার এই দ্বন্দ্ব এনে দেয় নতুন ভাষা, নতুন উচ্চারণ, নতুন বিন্যাস—আধুনিক কাব্যনন্দনের চাপে নতুন ধারণা আঙ্গিকের ও বিষয়ের। ফলে অনভ্যস্ত পাঠককে হোঁচট খেতে হয় বারবার। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো সদা-উদ্‌গ্রীব চলিষ্ণু পাঠকেরও রসগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, এমনই মৌলিক এর নবীনত্ব।[৩১]

এই মৌলিক ব্যবধানের জন্যই বিষ্ণু দে যেমন শুরু করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের 'অনভ্যস্ত' 'আদর্শ' থেকে, তেমনি এই ব্যবধান নেহাতই ভঙ্গি বা ছদ্মবেশ নয় বলেই সাবালকের মতো গ্রহণ এবং ব্যবহার করতেও পারেন রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ। যিনি কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সবচেয়ে আলাদা, তিনিই সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রবল ভক্ত পাঠক। বোঝা যায়, সম্পূর্ণ নতুন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতায়, তৎকালীন সাহিত্যিক গড্ডলিকতার বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে-র কবিতা যে 'অভিনবত্ব' সৃষ্টি করেছিল, তারই সুস্থ বিকাশ পদ্যের 'লঘুরস' থেকে ক্রমশ আত্মসংকটের সাক্ষাৎকারে, 'অনিদ্রাতাড়িত স্নায়ুর জ্যাবদ্ধ' উল্লাসে ও বিষাদে। এই বিকাশ আরো পরে কীভাবে সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং 'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্বে' এগিয়ে চলল—'অবিচ্ছিন্ন কাব্যে'র ধারা শুরু হতে পারল এই দ্বিধাহীন স্বাতন্ত্র্য থেকেই, তার ইতিহাস তো অন্য।

প্রত্যেকটি গল্পই খুব ছোট আকারে—৪/৫ পৃষ্ঠার। 'ফিরে-ফিরতি' ('প্রগতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ ব) গল্পে স্থধীশ ও স্বব্রতা এবং স্থধীশ ও অরুণার অসহ্য মন-দেওয়া-নেওয়ার খেলা—নাগরিক কৃত্রিম 'flattery' এবং 'rivalry'—তার বর্ণনায় লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি, যদিচ সিনিসিজমে ভরপুর, দ্রষ্টব্য। 'বাসব-রাত্রি' ('প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৫ ব) গল্পে বিলাত-প্রত্যাগত স্বামী সুরেশের জন্য স্ত্রী সুষমা-র ব্যাকুল প্রতীক্ষা, সুষমাকে দেখে সুরেশের আশাভঙ্গ, সন্দেহ, বিষাদ ইত্যাদি বহুবিধ ভাবালু হৃদয়চর্চার বিবরণ এবং অবশেষে মিলন—সমস্ত বর্ণনাতেই ঠাট্টার সুর তীব্র। 'বন্ধু' ('প্রগতি', অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ব) গল্পে স্কুলের বন্ধু ভজহরির প্রায় আদিম ভালবাসিটিকেই শুধু লেখক ঠাট্টা করেন নি—ঠাট্টাটা আর্টিস্ট-বন্ধু বসন্ত এবং নিজেকেও। প্রমথ চৌধুরীর ঢঙে রেস্টুরেন্টের আড্ডার গল্পে কাহিনী বা চরিত্রগুলো প্রকাশ্য হয়েছিল। 'হিরো' ('প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৬ ব) গল্পটিতেও—আগের মতোই আড্ডার সূত্রে লেখা—প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব খুব স্পষ্ট। তারুণ্যের স্বপ্নখচিত দিনে লেখকের হিরো সীতেশ কিভাবে নিকৃষ্ট কুৎসিৎ বিবেকহীন চরিত্র রূপে

প্রকাশিত হল, তার অনায়াস বিবরণ।

২২. বিষ্ণু দে, 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'। 'ধূপছায়া', আষাঢ় ১৩৩৫ ব। শ্যামল রায় ছদ্মনামে পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ।

২৩. বিষ্ণু দে, 'লরেন্স্ র‍্যাট্‌কিনসন্'। 'বিচিত্রা', বৈশাখ ১৩৩৬ ব।

২৪. বিষ্ণু দে, 'অগস্টস্ জন্'। 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৬ ব।

২৭. 'ধূপছায়া', শ্রাবণ ১৩৩৫ ব।

২৮. বিষ্ণু দে, 'এলিঅট', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। সিগনেট, ১৩৫৯ ব, পৃ ১১৬।

২৯. বিষ্ণু দে, 'বিচ্ছেদ' (অনুবাদ)। 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৮ ব।

৩০. এই সময়ের বিষ্ণু দে-র গদ্যরচনা :

'ডি. এইচ্. লরেন্স' (পুস্তক-সমালোচনা), 'পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৮ ব (১৯৩১)।

'অলডাস্ হাক্সলি' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৮ ব (১৯৩২)।

'বোনাল্ড বট্‌র‍্যাল' (ঐ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৩৯ ব (১৯৩২)।

'এলিঅট, অডেন, গ্রেগরি, পার্সন্স্' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৩৯ ব (১৯৩২)।

'আধুনিক স্থাপত্যের অর্থ' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৯ ব (১৯৩৩)।

'ডি. এইচ্. লরেন্স' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৯ ব (১৯৩৩)।

'ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ও ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি' (ঐ), ঐ, বৈশাখ ১৩৪০ ব (১৯৩৩)।

'এজ্রা পাউণ্ড', 'সোভিয়েট সাহিত্য' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৪১ ব (১৯৩৪)।

'রিচার্ডসের কল্পনা' (ঐ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৪২ ব (১৯৩৫)।

'টি. এস্. এলিঅট' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৪২ ব (১৯৩৫)।

# অবিচ্ছিন্ন কাব্য

১৯৩৩—১৯৫০

## 'তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার'

'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'—একই সময়সীমার মধ্যে রচিত বিষ্ণু দে-র প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে কবির আত্মবিকাশের একেবারে প্রাথমিক স্তরের চিহ্নগুলো সাজানো রয়েছে পর পর : বয়ঃসন্ধির আশানিরাশা, সত্তার গোড়াকার সংকট এবং সেই সংকট নিরসনের প্রাথমিক উদ্যোগ ও সাফল্য। বিশেষ করে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে তারুণ্যের মথিত আবেগ তোলপাড় করে তুলেছে সংশয়ের ও সংকটের এই চেহারাকে। অর্থাৎ এটা যেমন অপরিণত তারুণ্যের ও সংকটসঙ্কুল ব্যক্তিত্বের কাব্য, তেমনি আবার এখানেই ইশারা পাওয়া যায় কীভাবে যৌবনারম্ভের এই স্তরকে তিনি পার হয়ে যাচ্ছেন, পরিণতি অর্জন করতে চলেছেন, বা বলা যায়, এমন সব চাবি খুঁজে নিচ্ছেন, যা নিয়ে যেতে পারে কাব্য-আকাঙ্ক্ষার অন্য প্রকোষ্ঠে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থটি সেই ভেতরকার সংগ্রামের ও বিকাশের ইতিহাস।

এই গ্রন্থের পাতা উল্টে কবির যে ছবি পাঠকের সামনে থেকে যায়, তা হচ্ছে বয়ঃসন্ধির পর্বে এক ইন্দ্রিয়-সজাগ তরুণ কবির উল্লাস ও বিষাদ, নৈঃসঙ্গ্য ও তীব্র সংবেদন কীভাবে দানা বাঁধছে এবং মুক্তির পথ খুঁজে নিচ্ছে। সবল যৌবনের যা যা লক্ষণ থাকে, তার সবই আছে : মনের স্বাস্থ্য ও তেজ, উপলব্ধির অপরিপক্ক কিন্তু সম্ভাবনাময় রূপ, প্রেমানুভূতির তীব্র আকুতি অথচ বিষাদ ও নৈঃসঙ্গ্য। সব মিলিয়ে যৌবনের একটা গোটা বিকাশোন্মুখ চেহারা। অনুভূতির উল্লাস যেমন, তেমনি ব্যক্তির বিষাদ ও একাকীত্বের বোধও সুস্থ যৌবনেরই লক্ষণ। শুধু চিনে নিতে হয়, সেটা বড় কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিনা কিংবা তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার অন্তর্নিহিত কোনো চাপ আছে কিনা।

বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে কাব্য-আবেগেব পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বিষয় ও উপকরণের যতটা অভিনবত্ব, তার চেয়ে বেশি অভিনবত্ব বা স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, এই প্রথম পর্যায়েই, যৌবনোচিত সংবেদনের সীমানার মধ্যেই, তাঁর প্রকাশভঙ্গি বিস্ময়কর রকমের আত্মসচেতন। এই আত্ম-সচেতনতার সাক্ষ্য বহন ক'রে কবিতায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শব্দাবলি বা বাক্‌প্রতিমা বা বাক্যগঠনের ধাঁচ। বাংলা কবিতার টিপিক্যাল রাবীন্দ্রিক শব্দ-উচ্চারণ, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেকটা ত্যাগ করলেও, এমনকি বিষ্ণু দে-র সমসাময়িকেরাও আঁকড়ে ধরে ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং অন্যান্য আরো অনেকেরই প্রথমযুগের কাব্যভাষাতে ভাষার ঐ অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে এমন বলা যায় না। কাব্য ভাষার আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের বোধ তখনও অনেকটাই রক্ষণশীল। বিষ্ণু দে তুলনায় কাব্যিক ভাষার বর্জনে ভাষার মধ্যে দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের সঞ্চারে বোধহয় অধিকতর নিশ্চিত। যে-কথা সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হিরণকুমার সান্যাল বলেছিলেন, তা অনেকের সম্পর্কেই খাটে : '...অনেক কবিতাতেই কী মেজাজে, কী সাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। সুধীন কাব্যরচনার হাতে-খড়ি করেছিল রবীন্দ্র-নাথের হরফেই হাত বুলিয়ে, বিষ্ণু দে-র মতন নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের চেষ্টা না করে।'[১] বুদ্ধদেব বসু-র 'মর্মবাণী' (১৯২৪), জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' (১৯২৭) বা সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী' (১৯৩০)—এই প্রথম রচনাগুলির সঙ্গে বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর (১৯৩৩) তুলনা করলেই তাঁর ভাষার এই নবীনতা বোঝা যায়।

ভাষার দার্ঢ্য ও পরিচ্ছন্নতা, শব্দ-সমাবেশের আত্মসচেতন ঝাঁকুনি ও আকস্মিকতা—এরকম নানা লক্ষণ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকেই গঠিত হতে শুরু করেছে। ইতস্তত উদাহরণেও তাই পেয়ে যাই এই সব শব্দ-সমন্বয় :

সিল্‌কমসৃণ শাদা আর ছোট পাণ্ডু ললাট / বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ / সফরী চোখের সরল চাহনি / তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম / সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার / নির্ণিমেষ দেখি তুমিনিট, স্তব্ধতার শব্দ মাঝে একা / নিদ্রা আনে নবহর্ম্যরথে নবজাত পৃথিবী আমার / অগ্নিশিখা ঢাকো নীল মেঘে / অসিধার কঠিন আকাশ / নগ্নতায় দীপ্ত তনু / অজ্ঞাত ধমনী / সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ / গলন্ত তামার দীপ্ত রক্তিম চুম্বন / শব্দথর কুৎসিৎ নগর / পদতলে স্টীলনীল পারহীন

গভীর সাগর / স্নায়ুআলোড়িত উতলা কম্পন / আকাঙ্ক্ষার আমার আকাশ / বাসনার আশ্চর্য সিমফনি / মরেছে জোয়ার / গোধূলির দেহহীন আলো / দিশাহারা অন্তরাগ / অরণ্যের বিদেশী নিশ্বাস / স্তব্ধতার দীঘি / স্নানস্বচ্ছ লঘুদেহ / আলোক সোনাটা।

উদাহরণগুলির এককেটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সচেতনতাই প্রমাণ করে। কোথাও শব্দের নির্বাচনে বা ঈষৎ স্থানপরিবর্তনে, কোথাও বাক্-প্রতিমার কল্পনায় বা আবিষ্কারে ঐ তীক্ষ্ণ সজাগ আধুনিকতার স্থত্রপাত।

এই সুস্থ নতুনত্বের সৎ তাগিদেই ভারতীয় ঐতিহ্যাগত পুরাণ-উপমার পাশে সাবলীলভাবে এসে যায় প্রতীচ্য পুরাণের উল্লেখ। অবয়বের এই আধুনিকতাকে সমসাময়িককালে বুঝে ওঠা হয়তো একটু মুশকিল, একটু সন্দেহ থেকেই যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেও যেন এই সংশয়ের সাক্ষাৎ পাই।[২] কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই সহাবস্থান কোনো আন্তরিক তাগিদ থেকে নয়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রসঙ্গেও সে-কথা ওঠে। বিষ্ণু দে নিজেই সে-প্রসঙ্গে অনেক পবে লেখেন, 'অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত এই দুয়ের মধ্যে নির্ভয যোগাযোগে আধুনিক শিল্পীর প্রেরণা অর্জন করে একাধারে তার আন্তরিকতা ও তার বিশিষ্ট আততি। তাব প্রেবণার সততাই আধুনিক শিল্পের দুঃসাহসী অভিযানের মূল শক্তি। অনেকে ভাবেন, একালের শিল্পীরা-লেখকেরা জোর করে যেন চালাকি কবে তাঁদেব ধাক্কা দেন। আমার এক বন্ধুর উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট কবি। তিনি মনে করেন, ধরা যাক, "উর্বশী ও আর্টেমিস"-এ এই যোজনা ঐ শ্রেণীর ব্যাপাব। কারণ তাঁর কাছে উর্বশী বেদ থেকে কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ, কিন্তু আর্টেমিস তাঁর সাহিত্যিক হিঁদুয়ানিতে অপরিচিত লাগে। কিন্তু কবিতাটিতে এবং সেই থেকে বইটিব নামকরণে উর্বশী-প্রতীকের কেন্দ্রের বিপরীত কাব্যাবেগ দানা বেঁধেছিল আর্টেমিসের রূপে, শুচি কৌমার্যের তনু দেবী, চন্দ্রের হিম-অধিষ্ঠাত্রী, শিকারেব দেবতা আর্টেমিসেই। এবং এর জন্য শুধু ইংরেজি কাব্যলোকই যথেষ্ট। তা ছাড়া হয়তো ভারতীয়-গ্রীক যোজনাও মনেব পিছনে ছিল।'[৩] কবির বন্ধুর কাছে আপত্তিজনক ঠেকেছিল—কিন্তু আমরা জানি, 'উর্বশীর মায়া'-ব জগৎ ছেড়ে যে কবি নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রার ব্রত গ্রহণ করেছেন, স্বপ্নে রেখেছেন কৌমার্যের তনু বলীয়ান রূপ – তাঁব অভিজ্ঞতায উর্বশীর পাশে আর্টেমিস কতখানি আন্তরিক ও সংগত। সুতরাং তথাকথিত অভিনবত্ব বা নতুনত্ব মূলত আত্মসচেতনতারই

নামান্তর—আর এখানে তো কবির আত্মসচেতনতারই শুদ্ধ তীর্থযাত্রা।

আত্মসচেতনতার তৃতীয় লক্ষণ হিসেবে পাই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা ব্যক্তিকেন্দ্রের বাইরে যাওয়ার অবিরল অভীপ্সা কবির মনে। ভাষাগত শৈথিল্য বা আত্মসর্বস্ব বিষাদকে ঝেড়ে ফেলে মনের যে ক্ষিপ্রতা কবিতার শরীরে একটা আঁটসাঁট ভাব ও মধ্যপদলোপী দুরূহতা এনে দেয়, তার মূলেও এই খোলস ছেড়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা। এই নিরন্তর ছাড়িয়ে যাওয়া, বলাই বাহুল্য, পরিণতির দিকে যাত্রা। এ-কারণেই তো অশোক সেন 'উর্বশী ও ও আর্টেমিস'-কে বলেছেন 'প্রত্যক্ষের বা উপলব্ধির যাত্রারম্ভ'।[৪]

এই সীমাতিক্রমী চলিষ্ণুতার স্পষ্ট প্রমাণ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রতিমার বা অনুষঙ্গের পুনরাবর্তন। হয়তো কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে 'বলাকা'-র কথা, যদিও বলাই বাহুল্য অনেক কিছুই সেখানে আলাদা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বা নক্ষত্রলোকের এই সব প্রতিমা বা নিছক শব্দই এমন একটা ব্যাপ্তি এনে দেয়, যা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ব্যক্তিযন্ত্রণায় কাতর কবির পক্ষে ছিল অত্যাবশ্যক। এই শব্দপ্রাচুর্য থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় অবশ্যই।

> বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ ( 'পলায়ন' ) / তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র ( 'কাব্যপ্রেম' ) / অগ্নিশিখা ঢাকো নীল মেঘে / তোমার নেব্যুলা চোখ নক্ষত্রের জীবনে আমার···বিপ্লবের নৃত্য যে জাগায় / শূন্যতার আকাশ-কিনারে / ঢেকে দাও মুখ ঢাকো ছায়াপথ তোমার আঁচলে / তোমার নক্ষত্রচোখ দূরে নিয়ে যাও ( 'প্রেম' ) / আকাশের নক্ষত্র-আভা ( 'উর্বশী' ) / মেঘের তরঙ্গে ভেসে মৃত-স্বপ্ন আমার প্রিয়ারা ··চলে যাক সপ্তর্ষির পারে ( 'পর্যাপ্তি' ) / নক্ষত্রদেয়ালি নেই ( 'রাত্রিশেষে' ) / নভচারী উৎক্রোশ / তোমার হৃদয়ে তারা ঘোরে নানা রূপে রূপে নক্ষত্রসভায় ( 'প্রজ্ঞাপারমিতা·· ' )।

বিষাদ ও নৈঃসঙ্গ্যের পাশে-পাশে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা যদি না থাকে তবে ব্যক্তিমমতা চেহারা নেয় নিছক আত্মরতির ( ঠাট্টা করে যে কথা কবি বলেছেন, 'হে স্মর্সি, বেঁধেছ মোরে, আরো বাঁধো' )—কল্পনা ও অনুভূতির পরিণতি ঘটে বিকারে। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু তরুণ বিষ্ণু দে নির্মোহ আত্মজিজ্ঞাসার নির্ভরতায় ব্যক্তিমমতার

শূন্যগর্ভ লোভ এড়িয়ে অত অল্প বয়সেই উপার্জন করতে চেয়েছেন পরোক্ষতা—বিষাদ ও নৈঃসঙ্গ্যকে টেনে নিয়ে গেছেন কোনো দার্শনিকতার মামুলি সমাধানে বা আপ্তবাক্যে নয়, পরিপূর্ণ নেতির দিকে। একেই বলা হয়েছে 'কঠোর নেতির সাহস ও সংযম'।[৫] স্বাভাবিক যা ঘটে থাকে, অর্থাৎ 'ব্যক্তিচিত্রকে যুগচিত্র ভাবার' ভ্রান্তি ( বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষায় ) তাঁকে পেয়ে বসে নি—বরং বয়ঃসন্ধির ও অনুভূতিপ্রবণ প্রথম তারুণ্যের বিষাদযন্ত্রণার শুদ্ধ রূপ আবিষ্কারে মগ্ন থেকেছেন। যৌবনজ্বালা তিনিও ভোগ করেছেন, কিন্তু পরম ধৈর্যে তাকে রূপান্তরিত করেছেন নেতির যন্ত্রণাময় উপলব্ধিতে। তাই আগের ঐ আলোচকের ভাষাতেই বলা যায়, কবি 'নেতির পূর্ণতা চান স্নায়ুতে পেশীতে, শরীরে মননে, নিরালম্ব অস্তিত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে।' এবং এই নেতিই অগ্রসর হবার সোপান—প্রগতির প্রথম সিঁড়ি।

বলাই বাহুল্য এই নেতির একটা বড় আধার এ-সময়ে প্রেম। প্রেম সম্পর্কে যা কিছু রোমান্টিসিজম, যা কিছু মায়া-মোহ, প্রেমের চিরন্তনতা বিষয়ে যা কিছু স্বপ্ন বা কাতরতা—সবকে তিনি ত্যাগ করলেন। উর্বশীর মদালস সঙ্গ ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন আর্টেমিসের কঠোর নিঃসঙ্গতাকে। পুরূরবা উর্বশীকে চিরকাল ভালোবাসার কথা বলেছিল। কবি জানালেন, 'আমি নহি পুরূরবা।' এবং পরে মিতভাষণের তীব্রতায় বললেন: 'ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।'

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ১৯৩০-৩১ সাল নাগাদ কবিতাতে দেখা যায় এই বিরাগ ও শূন্যতাবোধ খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস বোধহয় এ-সময়ের সব আধুনিক কবিরই বৈশিষ্ট্য। এখানেও সংযত ভাষায় তাঁর 'বিবমিষা' খুব প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত দেখি, এই নেতিকে যে বলা হয়েছে 'প্রগতির প্রথম ক্ষোভ' বা আরেকটু বেশি অর্থসমারোহে; 'রাত্রিশেষে আসে অনাগত দর্শনের প্রভাত' —তা খুবই ন্যায্য।[৬] এই নেতির অর্থ নিঃশেষও নয় বা মনোবিকারের সূত্রপাতও নয়। এই শুদ্ধ নেতি—'নেতির নির্মোহ যন্ত্রণা'—আসলে ইতিবাচক একটি অভিজ্ঞতাই—নিয়ে যায় কবিকে প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে—সাবালকত্বে। তাই এই যৌবনোচিত সংবেদনের—'সবল, চরিত্রদীপ্ত, সুকুমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি'-র —বস্তুত আত্মসচেতনতারই—পরিণতি প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে। এই প্রতিবাদেরই একটি আদর্শ প্রতিমা নিঃসঙ্গ একাগ্র তীর্থযাত্রীর মধ্যে—কবির কথায় 'বলিষ্ঠতা নিঃসঙ্গ চলার'। তাই বিলাপে শেষ নয়, বিরাগ ও বিষাদ

তাকে নিয়ে যায় শূন্যতা ও নেতির শুদ্ধতায় এবং তা থেকে স্নাত হয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি তাঁর 'ক্ষুরধার' ব্রতে। এই কঠিন ব্রত আর কিছুই নয়, ব্যক্তি-সর্বস্বতার মোহ ঝেড়ে ফেলে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে চলেছে যে তীর্থযাত্রী, তাঁর ব্রত।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা প্রতিমা বারবাব ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো সাজিয়ে নিয়ে বসলেই বোঝা যায় কিভাবে এই আত্মসচেতনতা পর্যায়ক্রমে কাজ করেছে। পুরনো জগতকে ছেড়ে—'পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার'-কে ছুঁড়ে ফেলে—নতুনের দিকে যাত্রার সঙ্কল্প যে তীর্থযাত্রীর, স্বভাবতই তাঁর শব্দব্যবহারে আবেশ বা মোহের কথা, কামনাতাড়িত দেহ বা শরীরের কথা, স্বপ্ন ও মায়ার কথা বারবার আসবেই, বর্জনীয় উপাদান হিসেবেই আসবে। তাই প্রথমেই লক্ষণীয় ঘুরেফিরেআসা শব্দ: স্বপ্ন কিংবা দেহ বা শরীর কিংবা আবেশ বা মোহ ইত্যাদি। এই শব্দগুলি সমস্ত গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত সৈন্যের বাতিল অস্ত্রশস্ত্রের মতো। একত্র জড়ো করলে সেগুলো এরকম দেখাবে:

> স্বপ্ন স্বয়ম্বর/স্বপ্নের নিবিড় কুয়াশা/চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্নমূর্তি/স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে/স্বপ্নের আদি লোক/আদি স্বপ্ন/স্বপ্নছায়ে গেছে দিন, লঘু দিন/রূপকথা-স্বপ্ন বয়/তোমাব চেতনাঘর স্বপ্নে আজ করেছে রঙিন।
>
> যে মায়া বিছায়/যে মায়া ছড়ায় চেতনায়/লাবণ্যের মায়া আজ ধরেছে আমায়/আমাব চেতনা ছেয়ে মায়া জাগে/উর্বশীর মায়া লাগে।
>
> গোধূলি রঙিন তনু/তোমার দেহের মাঝে/দেহে তব গোধূলির ছায়া উরুবন্ধে বাহুবন্ধে বাঁধো/উর্বশীর দেহের আস্বাদ/উর্বশীর স্তন উর্বশীর পাণ্ডু উরু শুভ্র বাহু/নারীদেহরঙ্গিমা/পরশকম্পিত দেহ।
>
> শ্বেতচন্দন লেপ/কুমারী ভঙ্গিমা/ফুলের শয়ান ড্যানাযে/গন্ধে আতুর ভারাক্রান্ত মোহ/রাধিকা চাঁদ/সবুজ কুঞ্জবন/সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়া/সুমধুর কাকলি/বাসনাবিলাস/উপবন পূর্ণিমা/দোল রাত্রি কোজাগরী যামিনী জাগর/আবিরে মাতাল রাত্রিদিন/কোজাগরী শশী সমুদ্রবীজন-স্নিগ্ধ/দক্ষিণের কোমল বাতাস/আনন্দিত মোহ/সন্ধ্যার

> ম্লান ক্লান্তক্ষণ/সন্ধ্যার কবিত্বময় কোমল আলো/রোমাঞ্চনিবিড় সুবে সঙ্গীতমায়ায়/রূপকথা-স্বপ্ন/সন্ধ্যার বর্ণের ছটা/তন্দ্রালস সন্ধ্যা/সবুজের বাস/সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ।
>
> তোমার সর্পিল কেশ/তোমার কেশের গন্ধ/হ্রস্ব বন্ধহীন কেশে অন্ধকার কুঞ্চনে কুঞ্চনে/শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।

ইচ্ছে করলেই এ ধরনের পুনরাবৃত্ত শব্দ বা প্রতিমার তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া যায় এবং দেখানো যায় কিভাবে 'সবুজ', 'সন্ধ্যা', 'কোজাগরী', 'গোধূলি', 'কেশ' শব্দগুলি নানা সমাসসম্বন্ধে ঘুরে ফিরে আসছে।

কিন্তু এ গ্রন্থে আসল কথা তো স্বপ্নভঙ্গের কথা—কারণ উর্বশীর মায়ার জগৎ, দেহের কামনার হাতছানি, সন্ধ্যার কবিত্বময় আলো-কে উপেক্ষা করেই তো তাঁর জয়। স্বপ্নের জলপরী যে নেয়াডের ( naiades ) কথা বারবার আসে—সেই হাস্যলঘু নেয়াডের দিন আজ শেষ।

> স্বপ্নে তারা হারায় দীপ্তি/তোমারই স্বপ্ন দেখেনি গর্ভস্থ নিখিল/স্বপ্নদের সমাধি গহ্বর/স্বপ্নগুলি পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার/স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো/স্বপ্নের প্রাসাদ আজ ভেঙে দিয়ে তাই।
>
> ইত্যাদি।

কিন্তু রোমান্টিক যুগের ঐ স্বপ্নকে ফেলে কবি কোথায় যাবেন? এমন এক জগতে যেখানে মোহের আবেশ নেই, রূপের মায়াজাল বা 'দেহের অন্তহীন আমন্ত্রণ বীথি' নেই? রবীন্দ্রনাথ তো এই সৌন্দর্যবিলাসী জগতেরই একজন—তাই কবি ঘোষণার ভঙ্গিতে জানালেন, 'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্রঠাকুর।' সহজ রোমান্টিকতার অনায়াস সুখ ছেড়ে কবি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন দুঃখ ও অনিশ্চয়তাকে—একাকীত্বকে—দুশ্চর তপস্যাকে। এরই প্রতিনিধি হিসেবেই যেন কয়েকটি শব্দ এ-গ্রন্থে সবচেয়ে বেশি ফিরে ফিরে আসে—অন্ধকার, সমুদ্র, রাত্রি—বা কখনো সব কটিই একসঙ্গে : রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্র—এবং নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গতা।

> অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও/স্থিরতা-নিঃশব্দ অন্ধকার/অন্ধকারে হৃদয়/অন্ধকার জল/অন্ধকার জনহীন রাত জাতিস্মর ওঠে অন্ধকার/উগ্র অন্ধকার/গর্ভ অন্ধকার/অরণ্যের অন্ধকার/কণ্টকিত অন্ধকার/রাত্রির আঁধার/জনহীন স্তব্ধ অন্ধকার/অজ্ঞতার এ গূঢ় অন্ধকার/জনতা আঁধার।

সমুদ্রের অন্তহীন বুক/লবণাক্ত জল/সাগরের দেহ / সাগরের অভিসার/ সমুদ্রের স্নায়ু আজ অবসন্ন/শূন্যতার অশেষ সাগর/সমুদ্র মরুভূ হল আজ।

রাত্রির স্তব্ধতা/রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্র/অন্ধকার সমুদ্র।

বিনিদ্র আমার ভয়/নিদ্রাহীন ভয়/অনিদ্রার ঘন কালিমা/অনিদ্রার শূন্য / নিদ্রাহীন অন্ধকার / নির্নিমেষ অনিদ্রা / কত রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে/নিদ্রাহীন উত্তপ্ত শয্যা।

মোহ ও আবেশের রোমান্টিক জগত ছেড়ে আসার পর কবির মনে যে তীব্র নৈরাশ্য ও বিবিক্তি— হিম-অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা—এবং তার ভেতরের টেনশন জাগে, যাকে বলা হয়েছে নেতির নির্মোহ যন্ত্রণা, তার স্পষ্ট ও গভীর প্রতিমা এই অন্ধকার রাত্রির সমুদ্র। কবি এক কথায় তা বলেও দেন: 'সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে'—এবং এ-যুগে অন্তত সাগরের রূপ ঐ রকমই। ফলে এটা শুধু নেতি হয়েই থাকে না। পাশাপাশি নিদ্রাহীনতার পুনরুক্তি কবির মনের এই ক্লিষ্ট স্নায়ুকে, জাগ্রত বিক্ষোভকে, আত্মসচেতনতার যন্ত্রণায় দীর্ণ মনকে তুলে ধরে।

এই পরিবেশে সাবেকি প্রেম বা চিরন্তন প্রেম পরিত্যক্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! বারবার সে-কথা ওঠে:

প্রেম আজ ঘরছাড়া/প্রেম আর সাথী মোর নয়/আজ আর প্রেম নয়/আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই/সে ছায়ায় প্রেম নেই।

সে কারণেই কবি 'ক্ষণিকের মর-অলকা' বা 'ক্ষণিকেব আনন্দ-আলো'-র কথা বলে চিরন্তনতাকে উপহাস কবেন—'মুহূর্ত-বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি' দেখতে চান।

ফলে নিঃসঙ্গতাই কবির পাওনা হয়। 'সঙ্গীহীন দিন মোর/সঙ্গীহীন রাত্রি মোর।' অবশ্য এই নিঃসঙ্গতা শুধু পাওনা বললে ভুল হবে, আকাঙ্ক্ষাও বটে। 'শব্দখর কুৎসিৎ নগরে'—'মানুষের অরণ্যে'—যে ভিড় ও বেসুর, তা তাঁকে ক্লিষ্ট করে, তাকে ছেড়ে আসতে পারায়ও আনন্দ তাঁর। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই, আজ এই একাকীত্বে, নিজেকে মনে হয় 'বিদেশী পথিক'। প্রথমাবস্থায় ভয়ও জাগে—একাকীত্বের ভয়—পুরনো জমি ছেড়ে এসেছেন, নতুন জমিও অর্জিত হয় নি।

হাস্যহীন জাগে শুধু ভয়/মর্মরিত ভয়/বট আর অশথের ছায়াঘন কালো ভয়গুলি / ভয়ের আবেগে ছেঁড়া / জলস্থলব্যাপী ভয় দেহ মন নিয়ত কাঁপায়।

কিন্তু এ ভয় তো পালানোর ফিকির নয়, আত্মচেতনারই রূপান্তর। তাই যাত্রা থামে না—কঠিন নিঃসঙ্গ যাত্রা—'সমুদ্রের শ্বাস টেনে বাক্যহীন চলেছি একেলা।'

ক্রমশ এই নিঃসঙ্গ পরিবেশই প্রত্যক্ষ মূর্তি পেল 'মধ্যাহ্নের খরসূর্যে' বা নগ্ন পর্বতে বা মরুভূমিতে—কিংবা আরো স্পষ্টতর ভাবে দধীচি বা বজ্রপাণির উপমায়। বিশেষ করে খর সূর্য ও নগ্ন পর্বতের প্রতিমা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এই স্তরে।

> মধ্যাহ্নের খরসূর্য / মধ্যাহ্নের খররৌদ্রকর / খর রৌদ্রালোক / রৌদ্রালোকে তীর হল শুষ্ক মরুভূমি/বৈরাগিনী বালুকা।
>
> উলঙ্গ পর্বতে কভু উর্বশীর পড়ে নাই শ্বাস/কৃষ্ণ পর্বতের অঙ্গে নাই সবুজের বাস / শুভ্র ঋজু পর্বতশিখর / পর্বত আমাকে দিল আকাশের বৈরাগ্য মিতালি / পর্বতের শুভ্র দৃঢ়তা / জনশূন্য অরণ্য ও পর্বত বন্ধুর।

এই কঠিনের সাধনায় আবাধ্য সেই 'অর্ধনারীশ্বর', সব দ্বিধা ও দ্বৈতের অবসান, যার কাছে পৌঁছুবার জন্য প্রয়োজন হয় পৌরুষ যাত্রা—'পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি চলি পর্বতশিখর'। এবং 'দধীচি অস্থি', বিশেষ করে 'কঠোর কঠিন বজ্রপাণি'-র অনুষঙ্গ বারবার আসে, রং-ও এ সময়ের 'পিঙ্গল'।

শেষ পর্যন্ত এই নেতির সমুদ্র থেকে উঠে আসে, বৈরাগ্যের আকাশ থেকে নেমে আসে—'বালিয়াড়ি পার হয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে'—'সুদীর্ঘ সুঠাম নগ্ন তনু বলীয়ান', তার মধ্যেই কবি শুনতে পান প্রাণের স্পন্দন, আদিম ও অন্তহীন সংগীত, শরতের সূর্যের মতোই যে স্বচ্ছ, সেই অগুন্ঠিত নারী, গ্রীক দেবী আর্টেমিসই যার প্রতীক। এ রূপে কোনো মোহাবেশ নেই, আবেগোচ্ছলতা নেই, আছে নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের শুদ্ধতা।

> সদ্যস্মিত রজনীগন্ধার মতো একা,
> শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়
> তুমি এলে তরুণ তমাল···
> এলে তুমি নীরব নির্ভরে
> তনু সঙ্গীহীন। ('প্রত্যক্ষ')
> অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে

রৌদ্রে ও স্বর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান ! ( 'সাগর উত্থিতা' )
স্নানশুভ্র কুমারী... ( 'ছেদ' )

কবি কি তবে পৌঁছে গেলেন জীবনের 'প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা'-য় ? ভয় কেটে গেল ? প্রেমিকের হাত থেকে পেলেন 'নির্ভরের দান' পুষ্পস্তবক—'চিরজীবী নোজগে আমার'। নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনার যোগ্য প্রতিমা পেলেন এই 'স্নানশুভ্র কুমারী'-র মধ্যে। ঠিক যেমন বারবার ব্যবহৃত 'বাহু' শব্দটি রূপ পায় নৈঃসঙ্গ্যের অবসানে নির্ভরতার প্রতিমা রূপে।

বাহুটি জড়িয়ে তাকে বলি··· ( 'প্রজ্ঞাপারমিতা · ' )
বাহুটি শিথিল রেখে · ( ঐ )
অকস্মাৎ ডাক্‌লে আমায়,
দু-হাত ছড়িয়ে দিলে ( 'ভয়' )
ঢালো রৌদ্রে,
আলোক ছড়াও...
তার উত্তোলিত বাহুতে নিটোল। ( 'আলোক ছড়াও' )

তীর্থযাত্রী একদা পান্থশালা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ক্ষুরধার পথে, অবিচল প্রতিজ্ঞা নিয়ে, অসিধারব্রত সেই যাত্রা। প্রিয়ার চুলের গন্ধ, মাতাল দিনরাত্রির মায়া, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত, নেয়াডের লীলা বা গোধূলির প্রেমকে অস্বীকার করে সে বেরিয়ে এল একা। তারপর মরুভূমির মধ্যে কঠিন রূঢ় সূর্যালোকে কিংবা নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সমুদ্রের পারে নিদ্রাহীন তার যাত্রা। অবলম্বন শুধু বলিষ্ঠ পৌরুষ। অকস্মাৎ শরতের ঝকঝকে সূর্যালোকের স্পষ্টতায় পাওয়া গেল নগ্নতনু তরুণতমাল সেই প্রত্যক্ষকে। অতীতের মোহকে ছেড়ে তিনি পেলেন বাস্তবের নিরাবরণ নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি। বারবার যে 'সবুজে'-র কথা বলা হয়েছিল স্বপ্ন-আবেশে ( সবুজ কুঞ্জবন/সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ/সবুজের বাস ), তা ঘুচে গিয়ে এল রুদ্র বজ্রপাণির 'পিঙ্গলিমা' এবং সবশেষে 'শরতের দিনে'-র 'নীল' ( নীল মেঘ/ঘননীল আকাশে/পদতলে স্টীলনীল পাবহীন গভীর সাগর )। এই পরিক্রমার ইতিহাসকে কি চিত্রিত করা যায় না এইভাবে ?

সবুজ → পাণ্ডু → নীল
ধূসর
পিঙ্গল

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত   খর রৌদ্র   শরতের সূর্য
নেয়াডের লীলা
পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার   বজ্রপাণি   নগ্নতনু
উর্বশীর মায়া   আর্টেমিস
শেফালি   চিরজীবী নোজ্‌গে
( nosegay )

১. হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র'। প্যাপিরাস

২. 'উর্বশী ও আর্টেমিস' হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ পর-পর দুটো চিঠি লেখেন বিষ্ণু দে-কে ( ১৩ ও ১৭ জুলাই, ১৯৩৩ )। দ্র. 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২ ব।

৩. বিষ্ণু দে, 'মস্কভা-পিকাসো সংবাদ'। 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'। মনীষা, ১৯৬৭। পৃ ১১৩-১৪।

৪/৫/৬. 'অশোক সেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'সাহিত্যপত্র'। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬ ব। শেষ দুটি ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদের পরের উদ্ধৃতির উৎসও এই।

## 'কোথায় ঘোড়সওয়ার ?'

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ ছিল নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রীর অকপট আত্মোদ্‌ঘাটন, 'চোরাবালি'-তে সেই তীর্থযাত্রীরই আত্ম-আবিষ্কারের স্বরূপ ও সংকট বিন্যস্ত হয়েছে নানা ভাবে, নানা ভাষায়। আবিষ্কারের উপকরণ তো একটা নয়, তার নানা রেখা নানা বর্ণ। কবিতার বিষয়ও তাই বিস্তৃত। 'চোরাবালি'-তেও 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর অনুভূতি ও বিষয়ের পরিমণ্ডলই আছে—একই কালে উভয়ের বেশ কিছু কবিতা রচিত বলে তা স্বাভাবিকও বটে—কিন্তু সেগুলোতে এসেছে যেন নতুন মাত্রা, নতুন স্বর। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর একমুখী আবেগতীব্রতা এখানে বহুমুখী অন্বেষণে ছড়ানো। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর অভিজ্ঞতার ঈষৎ ব্যক্তিগত এখানে হয়ে উঠেছে অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক। অর্থাৎ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ নেতির যে প্রখর রূপ দেখা গিয়েছিল, তা এখানেও আছে—কিন্তু আগের মতো এখন তা যেন অতটা ব্যক্তি-আচ্ছন্ন নয়। আবার 'চোরাবালি'-তে নেতি থেকে মুক্তির যে আভাস আছে, তা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ সম্পূর্ণ

অপরিচিত না হলেও, ঐ পরিণতির সাক্ষ্য বেশি 'চোরাবালি'তেই। সে-কারণেই উভয় গ্রন্থ মিলে অভিজ্ঞতার একটা পরম্পরা ও পরিপূরকতা এনে দেয় — অভিজ্ঞতার গোড়াকার সততা ও সমগ্রতা—তাকেই বলা হয়েছে 'দুটি বইয়ের সমগ্রতা'।[১]

আর একটি কারণেও 'চোরাবালি' বেশি উচ্চাভিলাষী ও জটিল। আধুনিক মানুষের আত্মসচেতনতার পরিণামে কবিতার রূপকল্পে যে লক্ষণগুলি আসতে বাধ্য, তা 'চোরাবালি'-তে আরো বেশি স্পষ্ট। আত্মসচেতনতা-অর্জনের যে ভাষা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ সরল আবেগে উচ্চারিত, 'চোরাবালি'-তে যেন সেই ভাষাই বহুরঞ্জিত, ঐ উপার্জিত আত্মসচেতনতারই বহিঃপ্রকাশে—শব্দের সংকোচনে, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে বা প্রচলিত শব্দের অভাবিত বিন্যাসে, কাব্যোক্তির যুক্তিপরম্পরা ভাঙায়, উল্লেখ-উদ্ধৃতির, বিশেষত বিদেশী শব্দ বা নাম বা পুরাণের যথেচ্ছ ব্যবহারে। এ সমস্ত যে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'-এ ছিল না, তা নয় — তবে 'চোরাবালি'-তে তা সংখ্যা ও নৈপুণ্য উভয় দিক থেকেই গরীয়ান্। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুয়ের অভিজ্ঞতা ও প্রতীকের সমাবেশের যৌক্তিকতার কথা আগেই উঠেছিল, ঐ গ্রন্থে বিদেশী পুরাণের উল্লেখও আমরা অনেক পেয়েছি — কিন্তু 'চোরাবালি'-তে তার প্রয়োগ যেন আরো বাধাহীন।

'চোরাবালি'-র অধিকাংশ কবিতা যখন লেখা হচ্ছে, তখন বিষ্ণু দে ইংরেজিতে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষকতার কথা তিনি একাধিকবার বলেছেন। ঐ সময়ে তাঁর বিদেশী সাহিত্যের পড়াশোনা ও অধিকারের খবর শিক্ষকদের কানেও পৌঁছেছিল। তাই 'চোরাবালি'-তে ( 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এও ) বিদেশী পুরাণ বা দেবদেবী, বিদেশী সাহিত্যের কাহিনী বা চরিত্র বা নানা বাক্‌প্রতিমা ও উল্লেখ অজস্রভাবে যে এসেছে, সেটা তারই প্রভাবে ঘটেছে, এমন বলা যেতে পারে না কী? বিশেষ করে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নাম তো আমরা করতেই পারি, যাঁকে বিষ্ণু দে উৎসর্গ করেছেন 'চোরাবালি' গ্রন্থ এবং যিনি ছাত্রের আধুনিক কাব্যরচনার সপক্ষে প্রায় সমসাময়িককালেই লিখেছিলেন: 'আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করি ইহা বিদেশী প্রভাবান্বিত, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে এই বিদেশী প্রভাব আমরা বাস্তব জীবনের সর্বাধিক ক্ষেত্রে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছি এবং মানবমনের স্বাস্থ্য তাহার সততায় ও অখণ্ডতায়।'[২]

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রধানত এসেছিল গ্রীক ও রোমক পুরাণের দেবদেবী, ভারতীয় দেবদেবীর মতোই সংখ্যায়। বিভিন্ন অনুষঙ্গে এসেছে জলপরী নেয়াড, সুর্সি একাধিকবার, ড্যানায়ে, ডায়ানা (ইতালীয় দেবী, গ্রীক আর্টেমিসের অঙ্গাঙ্গী), এথিনা, ওরায়ান-প্রিয়া উষা, ভিনাস, এরস-মাতা ইত্যাদি। পুরাণের চরিত্রও এসেছে : হেক্টর বা ক্লিয়োপেট্রা। অন্যান্য কাব্যের অনুষঙ্গে ট্রিস্টান বা ইসোল্ড। নানা জ্ঞানে বা বিদ্যায় ম্যামন, নেআণ্ডরতাল্। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ যাকে বলেছেন 'সততা', বা কবি নিজেই যাকে বলেছেন আধুনিক মনের দুঃসাহসিকতা —'চোরাবালি'-তে তার প্রকাশ আরো নির্ভীক।

'চোরাবালি'-তে অবশ্য প্রতীচ্য-পুরাণের দেবদেবীর চেয়েও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীচ্যের প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের নানা চরিত্র, নানা অনুষঙ্গী ভাষা। এক 'শিখণ্ডীর গান'-এর 'কথকতা'তেই ঠাট্টার আবহাওয়ায় এসে গেছে কত চরিত্র—গ্রীক-রোমক পুরাণ থেকে তো বটেই, মধ্যযুগীয় ইওরোপীয় গীতিকা থেকেও। আধুনিক যুগের সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব কিছুই বাদ পড়ে নি। ডন্‌জুয়ান, প্লেটো, ডিয়োটিমা, সক্রাটিস, বর্ট্রাণ্ড রসেল, বেন্ লিন্‌সে, ওঅর্ডসওঅর্থ, কোলরিজ, শ্লেগেল, হেগেল, ডরথি, জীন্‌স ইত্যাদি কত নাম! আবার তার পাশেই হেলেন, অরফিউস্, পেনেলোপি, ব্রুন্‌হিল্ড, সীগ্‌ফ্রীড, ফ্রান্‌চেসকা। যে-কোনো ক্রম অনুসরণ করলেই এত নামের ভিড়ে পড়তে হয়। অন্যান্য বহু কবিতাতে আছে চসার, শেক্‌সপীয়র, বায়রন, ব্রাউনিঙ, ওয়াল্টার পেটার বা প্রি রাফায়েলাইট ইত্যাদি নানা যুগের সাহিত্য থেকে চরিত্র ও উল্লেখ।

বিদেশী পুরাণ বা চরিত্রের ব্যবহারের দিক থেকে দুই গ্রন্থের মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ তারা অনেকটাই সম্পূরক ভাবনায় বা আবেগে এসেছে, কিন্তু 'চোরাবালি'-তে প্রায়ই যেন তা আসে ব্যঙ্গ বা পরিহাসের সূত্রে। ইংরেজিতে যে কটি প্রকারভেদ আছে, হিউমার উইট বা স্যাটায়ার, সেই সোজা বা বাঁকা সব রকমের পরিহাসই 'চোরাবালি'-তে আছে। এই বৈদেশিক চরিত্র বা উল্লেখ বা তার অনুষঙ্গ 'চোরাবালি'র পরিবেশটাকেই যেন বেঁধে দিয়েছে। অসংখ্য খুঁটিনাটিতেই তা ধরা আছে। তাই এখানে কোনো কবিতাংশ শুরু হয় 'শুরু'-র ফরাসী ভাষান্তর 'দেবুতাঁৎ' দিয়ে, বা অন্য কোনো শুরু-র নাম 'রিফ্লেক্‌স' বা 'এটাক্‌সিয়া' বা 'জ্যোকন্দা'। এখানে ছড়ানো আছে : 'টাহিটির মেয়ে', 'আর্কেডিয়া', 'মোনালিসা', ব্রাউনিং-

দম্পতি 'এলসি ও বব'। 'বুদোয়ার' বা 'কামারাদেরি' তো আকছার। অবশ্যই প্রত্যেকটি শব্দ বা উল্লেখের পেছনে থাকে পঠনের ইতিহাস বা তার প্রয়োগে বাক্‌-নৈপুণ্য।

ক্রমশই দেখা যায় এই ব্যঙ্গ-শ্লেষ এ-কাব্যে আরও গভীরতর বোধে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুধু ঠাট্টা পরিহাস নয়, কবি তারও উপান্তে চলে যান বৃহত্তর কোনো দায়বোধে। স্পর্শ করেন আয়রনির বহুস্তর জটিলতাকে। তখন হেসে উড়িয়ে দায় শেষ করা যায় না। ব্যক্তি বা পটভূমির অসামঞ্জস্যকেও চিনে নিতে হয়। যদি তাতে বিক্ষোভ ও বিষাদের আক্রমণ ঘটে যায়, তবুও। পরিহাসবোধ তখন নতুন মাত্রা পায়, অন্যান্য দায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কবি জানেন, সমাজ ও ব্যক্তির যে বিভাজন ঘটে গেছে ঐতিহাসিকক্রমে, তাতে শুদ্ধ পরিহাস ক্রমশই হয়ে উঠছে অলীক, প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তির অভ্যন্তরে কাজ করে যায় বৈপরীত্য—আশার পাশে আশঙ্কা, উজ্জ্বল হাসির পাশে ট্র্যাজেডির বিষাদ, 'মেঘের রেশমি আড়ালে বজ্রের যাওয়া আসা'। এই বৈপরীত্যের চেতনা, পরিণামী চিন্তা, দ্বান্দ্বিক বোধ যখন জোট বেঁধে থাকে, তখন আয়রনির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

অবশ্য এই বোধ একদিনে আসে নি—তাঁর আত্মসচেতন যাত্রার স্বল্প ইতিহাসেও তা এসেছে অভিজ্ঞতারই মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এর স্বরূপ একটু পিছিয়ে গিয়ে আমাদের বুঝে নিতে হয়। বাল্যে বা শৈশবে বিষ্ণু দে যে ব্যঙ্গমূলক কবিতা লিখে সাহিত্যজীবন শুরু করেন, তার মধ্যে বেশ কিছু ছিল 'ট্রিওলেট'। সেগুলো প্রধানত প্রকরণের বহিরঙ্গ চর্চাই বটে, কিন্তু ক্রমশই তাতে তুমুল পরিবর্তন ঘটে যায়, যদিও পূর্বযুগের সেই চর্চার টুকরোটাকরা তিনি পরবর্তীকালেও ব্যবহার করেন নতুন বিন্যাসে। যে কারণে এই পরিবর্তন মূলত ঘটে, তা হচ্ছে সামাজিক মাত্রার সংযোগ।

'চোরাবালি'র পরিপ্রেক্ষিতটারই তার ফলে বদল হয়ে যায়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর নির্বিশেষ আবেগ একটা স্থানগত ও কালগত শরীর পায় এখানে। এর জগৎটাই হয়ে ওঠে কংক্রিট, প্রত্যক্ষ।

বিষ্ণু দে-র যে-জগৎ তখন সবচেয়ে চেনা, যার ভেতর তাঁর জন্ম ও অভিজ্ঞতা, সেই বিশ-ত্রিশের দশকের কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন 'চোরাবালি'-রও জগৎ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়ের কলকাতার বাস্তবতাই

এই ব্যঙ্গ কবিতাগুলির পরিবেশ। এই সময়ে, ভারতবর্ষের একটি অংশ হিসেবেই বাংলা দেশকেও নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছে—বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেরও সংকট। এই সংকটের আঘাত শ্রমজীবী মানুষের উপর যেমন পড়েছে, মধ্যবিত্ত শহরবাসী শিক্ষিত শ্রেণীকেও তা রেহাই দেয় নি। এক হিসেবে মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্দশা তো আরো মর্মান্তিক—বেকারির যন্ত্রণা সবচেয়ে তীব্রভাবে স্পর্শ করে তাদেরই। 'চোরাবালি'-র 'বেকারবিহঙ্গ' কবিতার আত্মঘাতী ব্যঙ্গে তার আভাস আছে।

অবশ্য এরকম একতরফা ছবি তো সমাজের পুরো চেহারা হতে পারে না। তাই পাশাপাশি বৈভব সৃষ্টির নতুন চোরাপথও তৈরি হচ্ছিল। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ প্রায় রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেছিল। অর্থ-নৈতিক মন্দার দিনেও টাকা খাটিয়ে আরো বড় হবার ফিকিব তাদের জানা। সেই প্রথম ব্যাপকভাবে সমাজে চালু হল 'দালাল', 'ফড়িয়া', 'ভেজাল', 'কালোবাজারি', 'তেজারতি' ইত্যাদি শব্দগুলি।[৩] উচ্চবিত্ত কলকাতার জীবনে, তার দৈনন্দিনতায় যে চকিত নাট্যরঙ্গ, তাই বাববার ফুটে ওঠে 'চোবাবালি'-র সামাজিক প্রতিমার জগতে। লেকে ভ্রমণ সকালসন্ধ্যায, সিগাবেট না খেয়েই লিলির হাসি, ছোট্ট ফ্ল্যাট, ঘুঘু ও ঘুঘুনীর জীবন, পার্টি, পার্টির উচ্ছল পরি-বেশে পিককণ্ঠী শমিতার বাগ্মিতা, রেস্ বা সিনেমার বার বা হাইকোর্টের শেয়ার-বাজারে নিত্য দেখাশোনা, কার্নিভাল এ-জীবনে ব্যস্ততা আর শ্রান্তি আর ক্লান্তি, বাতাস 'চুম্বনতাড়নাকম্প্র। বিকারগ্রস্ত উঁচু কপালে ইংরেজিয়ানা বা সংস্কৃতিপনার এই পরিবেশ সমাজের যে-অংশে মুখ্যত প্রতিফলিত হয়েছে সেই কপালফেরা বিত্তবান ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, তাদের ভুঁইফোড় চরিত্রহীন কাপুরুষতা ও নীরক্ত জীবনচর্চা 'চোরাবালি'-তে তীব্রভাবে পাওয়া গেল।

এই কৃত্রিম স্বার্থপর ক্লীব বৃহন্নলার জগতের চরিত্রায়নে যে অসামান্য বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরিহাসতীব্র সামাজিক বোধের স্পষ্টতায়, তা কারো কারো মনে হতে পারে আংশিকভাবে শেক্‌সপীয়রীয়, এমনকি একজনের অন্তত মনে হয়েছে চ্যাপলিনের কথাও[৪], কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এ-ধরনের কবিতা 'যেখানে অর্থবৈচিত্র্য বা বিষয়াতিক্রমের অবকাশ অত্যল্প' তার প্রতি অনাগ্রহ থাকার জন্যই মন্তব্য করেন: 'ক্রেসিডা বা ওফেলিয়ার মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দে-র করুণাকণা জোটে নি ...এবং ফলে এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে নি, শুধুই জুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবজ্ঞার

উপলক্ষ্য।'[৫] কথাটা কিছু দূর পর্যন্ত সত্যি, কারণ 'ক্রেসিডা' বা 'ওফেলিয়া'-তে ব্যঙ্গ-শ্লেষকে ছাড়িয়ে ঐ উভবলী আয়রনির যে গভীরতা আছে, তা হয়তো লিলি-রমা-অলকার কবিতাতে ততটা পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য, 'নেতিবাচক অবজ্ঞা'-র মধ্যেও কখনো নিহিত থাকতে পারে স্তরান্তরের স্বপ্ন ও জিজ্ঞাসা। কেউ-কেউ যে এ-কবিতাগুলিতে 'বায়রনি চটুলতা' পেয়ে যান[৬], সেই বায়রনের মধ্যেই তো আবার আজকের সমালোচক সন্ধান করেন ব্রেশটীয ভেরফ্রেমডুং-এর বীজ। তাই সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'বোঝা যায় না বিষ্ণু দে বখন হাসছেন, কাঁদছেন বা কখন'[৭], তখন তার জবাবে সমকালীন কোনো পাঠক নাকি ব্রেশটের উক্তির প্রতিধ্বনিতেই মজা করে বলেছিলেন, তিনি কাঁদছেনও বটে, হাসছেনও বটে। তবে সে হাসি-কান্নার স্বরূপটা অবশ্যই স্পষ্টতর 'ক্রেসিডা' বা 'ওফেলিয়া'তে, বা তার ব্যঞ্জনা আরো গভীরতা পায় পরে, তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের বাঁকবদল বিস্তারে।

এই ব্যঙ্গমুখর সমাজচিত্রণের একটা বড় সূত্র ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্ধমান যৌনপ্রাধান্য, যৌনসর্বস্বতা বা যৌনবিকার। বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডের প্রসঙ্গ ও প্রভাবের কথা এখানে ওঠে। ফ্রয়েডের মধ্যস্থতাতেই জানতে পারা যায় কিভাবে এই অসংহত সৃজনসম্ভাবনাহীন পরিবেশে প্রাণাবেগ বা লিবিডো 'অবদমনের বাঁকা খেয়ালে' যৌনবিকৃতিতে পৌঁছয় এবং তার অপ্রতিরোধ্য জের শুধু চেতনে নয়, অবচেতনের অজ্ঞান অনালোকিত জগতেও। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষয় ও চ্যুতিকে দেখেছেন এই বিচ্ছিন্ন রিরংসামুখরতার প্রতীকেই। যে-কবির বিষয় আমাদের এই চেনা বিপর্যস্ত সমাজের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বাস্তবতা, তাঁর কবিতাতে তো সুতরাং প্রবলভাবে থাকতেই পারে যৌনকাতরতার ভারসাম্যহীন ছন্দহীন এই বিশ্ব।

প্রেমের এই যে বিকার, তার বর্ণনা শুরু হয়েছে ঠাট্টা দিয়েই। সতেরো বছর বয়সে 'আধুনিক প্রেম' নামে যে-কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, যা পরে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অনুষঙ্গে 'মন-দেওয়া-নেওয়া' নামে গ্রন্থস্থ হয়, তাতে প্রেম ও শরীরধর্মের সমীকরণ করেন বুর্জোয়া আধুনিকতায় দীক্ষিত ও পরিস্নাত কোনো যুবার ভাগ্যে। বলা বাহুল্য, পরিবেশটা সে-যুগের ঐ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত কলকাতার ড্রইংরুম সংস্কৃতি যার পরিণামে কেবল 'বেজায় ক্লান্ত শ্রান্ত লাগে'। 'মন-দেওয়া-নেওয়া'র ঐ প্রায় অকালপক্ক উপলব্ধিই 'প্রথম পার্টি' কবিতায় যেন

ঈষৎ আত্মজৈবনিক ভাবালুতায় গল্পের প্রত্যক্ষ রূপ পেল, পার্টির যে-পরিবেশে আছে 'সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিশ্বাস' 'সুবর্ণের সুরেশের কদর্য নিশ্বাস'। কবি জানেন, 'এই অবসর ক্ষয়ের ধরন' আসলে 'কাপুরুষতার প্রাণহীন গূঢ় ছদ্মবেশ', 'অহিংসার বৃহন্নলা রূপ'। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জেগে থাকে শুধু তারুণ্যের উদ্গ্রীব, প্রতীক্ষারত 'স্নায়ুশিরা'।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ধনতান্ত্রিক সমাজে বিকারই পরিণাম স্নায়ুর এই সজীবতার। তাই 'যযাতি' কবিতায় বারবার বলা হয়েছে 'যযাতি-শিরা' বা 'যযাতি-শিরার প্রবল গান', যে গান আসলে 'প্রলাপ-কম্প্র'। অতৃপ্তকাম যযাতির মধ্যে যে অশান্ত ভোগতৃষ্ণা অনির্বাণ জ্বলতে থাকে, সেই 'স্নায়ুদাবদাহ'ই আজকের জীবনের সত্য—হয়তো বৃহৎ সমাজের বিচারে খুবই খণ্ডিত ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কবির চেনা এই জগতের বাস্তবতায় তা-ই সত্য। 'আধুনিক' জীবন তো এই খণ্ড অভিজ্ঞতারই জীবন, তাই স্নায়ুদাবদাহ যেন আধুনিক বুর্জোয়া জীবনেরই মর্মার্থ।

স্নায়ুর এই পীড়া চারিয়ে যায় অন্তর্জগতেও, মানবিক অবচেতনায়। 'সন্ধ্যা' কবিতায় 'জাতিস্মর' বন্ধুদের অতীতস্মৃতি, মনের গহ্বরের গন্ধর্ব-কিন্নর, যারা 'উলুপীর জ্ঞাতি' তারা হাত ছুঁয়ে যায় চেতনার। উলুপী পাতালের নাগরাজ-কন্যা, যাঁর ছিল এমনকি ব্রহ্মচারী অর্জুনকে বাঁধবার মতো আকর্ষণীশক্তি —অবচেতন কামনার প্রতীক কি সে? বেশ কয়েকবার যেমন উলুপীর উল্লেখ পেয়ে যাই, তেমনি অন্তত তিনবার আসে গ্রীক-রোমক পুরাণ থেকে প্রসার্পিনা এ-গ্রন্থে। প্রসার্পিনা-ও অবশ্যই পাতালের রাণী, হেডিসের স্ত্রী। ফুলচয়নরতা প্রসার্পিনাকে চুরি করে পাতালে নিয়ে যান হেডিস। পাতালের দেবী প্রসার্পিনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যারা তার মধ্যে আছে আত্মমুগ্ধ নার্সিশাস। প্রসার্পিনার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে সৌন্দর্য ও মোহ, কিন্তু তার প্রকাশ দিবালোকের উজ্জ্বলতায় নয়, পাতালের অনালোকিত ছায়াচ্ছন্ন ভুবনে—'সন্ধ্যা' কবিতায় যেমন বলা হয়েছে, 'জনহীন শব্দহীন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে'।

এই যে মোহ—যা আসলে 'ফাঁকা লিবিডো'-র প্রকাশ, তার চাপে সমস্ত সম্বিৎ যেন ভেসে যায়, ক্ষুরধার আত্মসচেতনতা ক্ষয়ে যায়। জেগে থাকে শুধু 'ভস্মলোচন তৃষারা'। 'অপস্মার' কবিতায় মৃগীরোগের প্রতীকে এই 'ব্যভিচারে'র বর্ণনা করা হয়েছে (অপস্মারের অর্থ যেমন মৃগী রোগ, তেমনি আলঙ্কারিকভাবে ব্যভিচার)। শুধু প্রশ্নে-প্রশ্নে কবিতাটি শেষ হয়। আজকের রোগ কি

রোগগ্রস্ত পূর্বপুরুষেরই দায়ভাগ? আর রোগগ্রস্ত বিকার ও ব্যভিচারেই কি সব শেষ হবে? প্রাণের পরাজয় ঘটবেই?

প্রেমের রুগ্নতা অবশ্য শুধু যৌনকাতরতা বা যৌনসর্বস্বতাতেই নয়, দেহধর্মের আপাত অস্বীকৃতিতেও, সূক্ষ্ম রুচিবাগীশতাতেও। সে-কারণেই বর্তমান জগতের রিরংসাপ্রাধান্য যেমন, তেমনি ভিক্টোরীয় বা পেটারীয় ধূসরতার নন্দনও তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যঙ্গের বিষয়। এই জীবনবিমুখ বৈদেহী সৌন্দর্যবোধ যৌনসর্বস্বতারই অঙ্গপিঠ—কবির উপমায় বলা যায় পঞ্চশর দগ্ধ হয়ে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়। ঠাট্টা করে বিষ্ণু দে বলেন, 'শহরের বুকে পাঁচতলায়' 'ছোট্ট ফ্ল্যাট' নিয়ে, গোলমালকে 'পায়ের ম্যাট' করে, 'ঘুঘুনি ও ঘুঘু'-র মতো জীবনযাপন এবং খাবার সময় চর্বচোষ্যের 'বর্বরতা'-র বদলে 'নব্য সুষ্ঠু নিরাপদ ভোজ' গ্লুবোজ খাওয়া।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়, মধ্যভিক্টোরীয় রুচিবাগীশতা বা 'মরীয়া লিবিডো'-র বিকার, যাকে কবি প্রত্যাখ্যান করতে চান, তার সঙ্গে কবির তৎকালীন মানসিক টেনশন ও প্রতীক্ষার অন্তরালে যে যৌনসচেতন সুস্থ জিজ্ঞাসা আছে, তাকে এক করে ফেললে চলবে না। এই জিজ্ঞাসাই তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় অন্তর্জগতের বা মনোজগতের উঁচুনিচু নিদ্রাজাগরণময় বাস্তবতার ভেতর দিয়ে—সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য তাঁর বহু কবিতায়। এরই চাপে সমস্ত পরিবেশ তাঁকে তীক্ষ্ণ সজাগ করে তোলে :

সমস্ত পৃথিবী আজ আকাশবাতাস
আমার সমগ্র মন, প্রতি স্নায়ুশিরা
শহরের উপকণ্ঠে জ্বালে অন্তহীন দূর আকাশের নীলে
কোলাহলহীন কোন্ অলৌকিক দেয়ালির আলো!

('প্রথম পার্টি')

এই অভিজ্ঞতা ও প্রতীক্ষা যে ব্যর্থ হয় নি, প্রাণের পরাজয় যে ঘটে নি, তার প্রমাণ, সেই প্রাণধর্মের স্তব বেশ কয়েকটি কবিতায়। যেমন 'পঞ্চমুখ'। কিংবা 'মহাশ্বেতা'। 'মহাশ্বেতা' কবিতায় আর্টেমিসই যেন ফিরে এল ভারতীয় রূপে—আত্মসচেতনতার সংগ্রামে কবির সেই পরম প্রাপ্তি সৌন্দর্যের নগ্নতনু রূপ। মহাশ্বেতা বাণভট্ট ও ভূষণভট্টের 'কাদম্বরী' থেকে উঠে এসেছে : সংস্কৃতকাব্যে শৃঙ্গাররসের অতিরেক তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তারই মধ্যে

মহাশ্বেতার সৌন্দর্যবর্ণনা ও চরিত্রায়ন বিষ্ণু দে-র তৎকালীন প্রতীচ্যকল্পনায় আক্রান্ত ও আর্টেমিস-রূপমগ্ন কাব্যভাবনায় খুবই সংগতিপূর্ণ। 'কাদম্বরী'-র প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ[৮] থেকে মহাশ্বেতা-র এই বর্ণনার সামান্য দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ছে দেহের জ্যোতিঃ।

শুভ্রতার যেন এক জীবন্ত মূর্তি।

আকাশ-পথে থম্‌কে-যাওয়া যেন শরতের একখানি মেঘ।…

কী সৌন্দর্যের শুভ্রতা!…

ধীরে ধীরে চন্দ্রাপীড়ের মন অপ্রাকৃত সৌন্দর্য থেকে প্রাকৃতে এল নেমে। প্রাকৃতেও সে সুন্দর।…

এ সেই রকমের সৌন্দর্য যেন ধর্মের হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসেছে—বজতরসে যেন স্নাত, শঙ্খেতে যেন উৎকীর্ণ।…

ধীরে ধীরে আমার [ মহাশ্বেতার ] কিশোর তনুতে হল যৌবনের আবির্ভাব।…

আমি আমার মায়ের সঙ্গে স্নানে এসেছিলুম এই অচ্ছোদসরোবরে।… স্নান সমাপন করে সখীদের সঙ্গে এমনি—ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম এই অচ্ছোদতীরে।

এই অংশগুলিতে 'মহাশ্বেতা'-কবিতার চিত্ররূপকল্পনার সাদৃশ্যই শুধু লক্ষণীয় নয় ( অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান, ভাস্কর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি, তোমার প্রাকৃত বাহু, ইত্যাদি ), সামগ্রিকভাবেই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'র যুগের সৌন্দর্যচেতনারও সামীপ্য আছে এখানে—এমনকি শরতের বর্ণনা পর্যন্ত ( বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রথম থেকেই শরতের অনুষঙ্গ মুক্তির বার্তাবহ )। 'মহাশ্বেতা' কবিতা থেকেই এই তালিকা আরো বাড়ানো যায়—'স্বপ্ন-সারথি', 'স্বপ্নবাণী', স্তনচূড়ার ছায়া, শরীরে হিমগিরির গান, নয়নের মদিরেক্ষণ মায়া, ইত্যাদি সমস্তই 'কাদম্বরী'-র জগতের শব্দগুচ্ছ—ঠিক যেমন 'কাদম্বরী'-তে মহাশ্বেতার বর্ণনা 'এত লাবণ্য এত শুভ্র জ্যোতিঃ' বিষ্ণু দে-র কবিতার পাঠকের খুব চেনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা তো বলাই বাহুল্য আধুনিক কবি এগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, এর ভেতরে এমন তাৎপর্য বা মাত্রা বা তীব্রতা প্রবেশ করিয়ে দেন যে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যুৎ-

স্পর্শ ঘটে যায়। আর তারই ফলে আর্টেমিস ও মহাশ্বেতা এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে।*

অবশ্য অন্যদিক থেকে, বাংলা কবিতার জগতে আর্টেমিসের প্রবেশ আকস্মিক ও বিস্ময়কর হলেও 'চোরাবালি'-র মহাশ্বেতা যেন এক-অর্থে আরো গভীর তাৎপর্যময়। মহাশ্বেতার পৌরাণিক উল্লেখে দুটি অনুষঙ্গ : স্মৃতি এবং প্রতীক্ষা। পুণ্ডরীকের জন্য মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা। 'চোরাবালি'-র দিগন্তে সব সময়ই নানা ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়ে আছে এই প্রতীক্ষা।

'পঞ্চমুখ' কবিতাতে অভিজ্ঞতার সেই পরিণতিতেই—দিনরাত্রিজাগর প্রতীক্ষার শেষে- মুক্তি আসে অমৃতজ্যোতি তনু রূপে।

প্রেম যে আমার হল প্রতীক্ষায় প্রস্তুতিতে
দিন রাত্রি আজ চিরজাগা।
একদা আমারই হবে জয়।
বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে,
পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
ঝরে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা।
হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে মেলে দেবে পাখা।
তোমার ও দীপ্তি মুক্তি পাবেই আমার চিত্তে, কোনো তরুণ তমালে,
একদিন, একরাতে, কোনো এককালে।

'তরুণ তমাল'-কে চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবার কথা নয়। এখানেও আছে 'মানসবলাকা'-র কথা, সেই মুক্তগতির কথা—'উভচর' কবিতায় যেমন

* 'কাদম্বরী'-র এই সামীপ্য শুধু 'মহাশ্বেতা'-তেই নয়, কোনো পাঠকের লোভ হতেই পারে 'চোরাবালি'-যুগের লিবিডোর বাঁকা-পথের আধুনিক মনস্তত্ত্ব স্বীকৃত ব্যাখ্যার আলোকে 'কাদম্বরী'-র অন্য কোনো কোনো অংশ, যেখানে বর্ণিত হয়েছে 'নবযৌবনের ক্ষুধা'-র 'উন্মাদিনী পরিণতি' এবং বানভট্ট যাকে বলেছেন 'মানসিক অসুস্থতা', তার তুলনামূলক পাঠ। চন্দ্রাপীড়ের কামনাতপ্ত কিন্তু অচরিতার্থ মিলনাকাঙ্ক্ষার পর 'ধীরে ধীরে চন্দ্রাপীড়ের সত্তার এক উৎকট পরিণতি ঘটতে লাগল। কামনাজর্জর চিত্তে যতই হয় অদ্ভুত স্বপ্নের বিলাস, গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত, দুর্বিনীত চিন্তার উত্থান, ততই হতে থাকে পারিপার্শ্বিক জ্ঞানলোপ। / চারিদিক অন্ধকার করে রাত্রি আসে; চন্দ্রাপীড় ভাবে—তার হৃদয়ের কালিমায় কালো হয়ে গেছে শর্বরী।…/নিদ্রা-বিহীন শয্যায় রাত্রি কাটে চন্দ্রাপীড়ের।' গন্ধর্বলোকে মর্ত্যের মানুষ চন্দ্রাপীড়ের অভিজ্ঞতা যেন স্বপ্নলোকে ভ্রমণ—যেখানে দেখা মেলে অসামান্য রূপসী কিম্পুরুষ বা কিন্নর, সুন্দরী গন্ধর্ব কন্যাদের, মাতাল হয় মন তাদের মোহাবিষ্ট সান্নিধ্যে। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কি তারই অনুষঙ্গে 'সুপ্তিশান্ত মগ্ন মননের মদনৃত্য' বোঝাতে কবি লেখেন : 'গন্ধর্ব কিন্নর।সদ্ধ যারা করে স্বপ্নশৈলে বাস'?

'ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধত গতি' বা 'পার্থির আবেগে'র কথা। তাই 'উভচর'-এর 'মেরুচারিণী'-ও মহাশ্বেতা বা আর্টেমিসের সগোত্র।

অবশ্য ধ্রুপদী সৌন্দর্যকল্পনায় তিল তিল করে গড়ে তোলা মহাশ্বেতার আদর্শায়িত রূপ যেমন চোখের সামনে আছে, তেমনি আবার কবি বারবার নেমে আসেন বাস্তবের জমিতে বা হয়তো বলা যায়, সেই মৌল প্রতিমাকে বাস্তবের চেনা রূপে সামনে আনেন। 'পঞ্চমুখ' কবিতার ৫নং অংশটিতে মহাশ্বেতা ছেড়ে তিনি মন দেন 'স্নিগ্ধদেহ, সামান্য উৎসুক' সাধারণ কোনো মেয়েতে। 'সামান্য যে মন তার? তবু তাকে লেগে থাকে ভালো।'

মানি যে সে সাধারণই মেয়ে,
মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো।

রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে এ মেয়ে আমাদের খুব চেনা, পরে বিষ্ণু দে-র কবিতায় যার আলেখ্য বারবার আসে, আরো সামাজিক তাৎপর্যে, বিবিধ চেতনায় একটা স্থায়ী প্রতিমা হয়ে ওঠে, তার জন্ম এই কবিতাটিতেই।

এইভাবে এ-যুগের 'ঘৃণার শ্বেতোর্মিস্পর্শ' ও 'উচ্ছল ক্লান্তি' কিংবা 'অশ্লীল নিঃশ্বাস' ঠেলে-ঠেলে তিনি যতই গতির ছোঁয়া পান, প্রেমের আদর্শ ও দৈনন্দিন বাস্তবকে বিরোধ ও ঐক্যের তাৎপর্যে এক সুতোয় বাঁধতে শুরু করেন, ততই তার নির্ভরতা গাঢ় হতে থাকে এই নবলব্ধ আত্মসচেতনতায়।

এই আত্মসচেতনতাই প্রতিফলিত কবিতার শরীরের প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যে। শব্দব্যবহারের ধরনে, স্তবক সাজানোয়, বাক্প্রতিমার নির্বাচনে সব-কিছুতে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এই দেখা গিয়েছিল সংহত ও পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত শব্দ-ব্যবহার। 'চোরাবালি'-তে দেখা যাচ্ছে সেই সংহত ও ছোট বাক্য বা বাক্যাংশে বিরাটকে ধরে রাখার অসামান্য নৈপুণ্য এবং তা থেকেই গড়ে উঠছে উচ্চারণের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর/কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর/কথারা
আমার গৃহহারা/রাত্রি ও আমি একা/তপস্যা আজ নিদ্রার আরাধনা/জন্মে
প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ/প্রেম যে গোষ্পদ জল শুষ্কপ্রায় গ্রামের ডোবার।

ইংরেজিতে যাকে এপিগ্রাম বলে, সেই তীক্ষ্ণ স্মরণীয় ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি ছড়িয়ে থাকে এ-সময়ের কবিতায়—ফলে আত্মসচেতন ব্যঙ্গমুখর কথনভঙ্গিতে বা ছন্দেও একটা আলাদা টান ও দোলা আসে।

সভ্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।
তবুও তোমাকে খুঁজে ফিরি দেখ কলকাতায়!
রিজর্ভ ব্যাঙ্কে কেন যে তোমার চুক্তি নেই! ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')
জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই,
সেই সাধনায় মেনেছি সতত হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।
বিবাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে খেই…('বেকারবিহঙ্গ')

আবেগেব এই চাপ প্রকাশ পেযে যায় নানাভাবেই— কখনো অবিরল প্রশ্ন-সঙ্কুলতায়, কখনো রাবীন্দ্রিক কবিতাংশ বা চরণের বাঁকা ব্যবহারে, কখনো বিদেশি নাম বা ছিন্ন প্রসঙ্গের সমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত উল্লেখে। এর ভালো উদাহরণ 'কবিকিশোর'-এব অন্তর্গত 'প্রলাপকম্পন'। কবিতাটি শুরুই হয়েছে 'সোনারতরী'-র 'নিদ্রিতা' কবিতার প্যারোডি হিসেবে, আর তার সঙ্গে অদ্ভুত নৈপুণ্যে মিশিয়েছেন কবি হোরেস থেকে ডাউসন পর্যন্ত সমাদৃত সাইনারা-র বিধুর সৌন্দর্য। ঠিক এরকমই প্রকরণ-চাতুর্যে ঠাট্টাব অমোঘ পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে 'শিখণ্ডীর গান'-এ। 'চোরাবালি'-র বহু কবিতাতেই। কোনো-কোনোটা শেষ হয়েছে প্রশ্নে-প্রশ্নে, মন্থিত আবেগের আরোহণে, 'ঘোড়সওয়ার'-ই বোধহয় তার চূড়ান্ত উদাহরণ।

'চোরাবালি'-র যে চারটি কবিতা সর্বাধিক পঠিত, তারা কবির আত্ম-সচেতনতার যে সংকট, তার সমাধান-প্রচেষ্টারই তিনটি স্তম্ভ বলা যায়। আত্মসচেতনতার লক্ষ্যই হল, রুগ্ন পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির যে সংঘাত, তাকে কিভাবে আত্মস্থ ও অতিক্রম করা যায়। কিভাবে মুক্ত করা যায় এই অর্গলকে, এই বন্ধনকে। 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে অনুভূতির পুরনো ও রাবীন্দ্রিক ঐক্যকে ভেঙে ফেলে আপাত-অসংহতির শিল্পবিন্যাসে তিনি মুক্তি খুঁজলেন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় প্রতীকের শুদ্ধতায় বা স্বাবলম্বনে। এবং 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'-তে পরোক্ষ ও পরিচিত প্রসঙ্গেব স্বকীয় ব্যবহারের কৌশলে, ট্র্যাজিক আয়রনির বিন্যাসে, দ্বান্দ্বিক সত্যের ক্রম-উপলব্ধিতে। এই যুগের কাব্যসাধনার ফলশ্রুতি হিসেবেই তাই ঐ চারটি কবিতা স্বতন্ত্র মনোযোগ পেতে চায়।

১

টপ্পা-ঠুংরি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'বঞ্চিত' ও

'অপরপক্ষ' কবিতা দুটির যেন পুনর্লেখন।[৯] রবীন্দ্রযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বাস্তব ও নন্দনের পার্থক্য ফুটে উঠেছে এই পুনর্লেখনে। এই সূত্রেই এলিঅটের কবিতার প্রকরণগত প্রভাবও এখানে লক্ষণীয়। কলকাতার নাগরিক জীবনের খণ্ডতা, অসংলগ্নতা ও ভঙ্গুরতা মূর্ত 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার যুগোচিত আবেগসাবল্য এখানে নয়—আমাদের খণ্ডিত বর্তমান ফুটে উঠেছে এব বক্রোক্তিতে, বহুমাত্রার বিন্যাসে, জটিল প্রকরণে। তার ফলে হয়ে উঠতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ওপর নির্ভর করেও সম্পূর্ণ মৌলিক একটি আধুনিক কবিতা। কবিতার প্রতিটি অংশে, উপমায়-প্রতিমায়-উল্লেখে পুরনো কবিতার ছিন্ন চরণ, টুকরো শব্দ বসিয়ে-বসিয়ে কখনো প্রতিতুলনায়, কখনো সার্থক অনুষঙ্গে, বিচিত্র মেজাজ তৈরি হয়েছে—আবেগ ও মননের এক জটিল মিশ্রণ, ব্যঙ্গ ও সাবল্যের বুনট।

দুই কবির কবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে বোঝা যায় ঠিক কোথায় কী ভাবে আধুনিক কবি সরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। শুধু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদ্ধৃতিতে তার আভাসমাত্র এখানে দেওয়া যায়।

আরম্ভেই এই পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্টকার্ডখানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানি নে তো। ( 'বঞ্চিত' )

আধুনিক কবি লিখলেন :

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা লয়ে
পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণি,
রেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ। ( 'টপ্পা-ঠুংরি' )

শুধু বিদেশী শব্দে উপমাপ্রয়োগই নয়, নাটকীয় তীব্রতা একেবারে প্রথমাবধি উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল।

স্টেশনে যাওয়ার ব্যস্ততা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় লিরিক পুঙ্খানুপুঙ্খে বলা হয়। বিষ্ণু দে-র কবিতায় কিন্তু নাটকীয় তীব্রতা ও প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠার বৈপরীত্যে সমস্ত পরিবেশ মন্থর। পোস্টকার্ড এল যেন 'পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণি', ( ছড়ের বদলে আঙুলের ব্যবহারে যেমন সৃষ্টি হয় আবর্তের ), কিন্তু 'দিন কাটল যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে' ( কাফি বা খাম্বাজের মতোই ঠুংরি অঙ্গের সুরে )। সমস্ত

কবিতার বিন্যাসেই এই বিলম্বিত লয় এবং তার মাঝে মাঝেই আকস্মিক ঘূর্ণি বা আবর্ত। এই সাংগীতিক বিন্যাসের কারণেই কি কবিতার নাম 'টপ্পা-ঠুংরি'?

তারপর লিপিকার জগৎ, বলাকার জগৎ, কখনো বা লৌকিক ছড়া—টুকরো টুকরো দু-এক লাইনে অনুষঙ্গ আসে—কখনো ব্যঙ্গে, কখনো সহকারী অনুভূতিতে।

যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা বা প্রস্তুতি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মনের উদ্বেগ রূপ পায় চারপাশের স্থির বা চলমান দৃশ্যের বর্ণনায়—কখনো কখনো নিরপেক্ষ উদাসীন স্বভাববর্ণনায় কখনো-বা প্রতিফলিত দৃশ্যের উপমায়। কিন্তু সব মিলিয়ে সংলগ্নতা হারায় না।

স্টেশনে এসে দেখি গাড়ি আসেই না,
জানি নে কতক্ষণ গেল—
পাঁচ মিনিট, হয়তো পঁচিশ মিনিট।...
গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলই মুখ মুছছি রুমালে।
কোন্-এক স্টেশনে
বাঁকে করে ছানা এনেছে গয়লার দল। ('বঞ্চিত')

কিন্তু বিষ্ণু দে-র জগতে সমস্ত সংলগ্নতাই ছিন্ন। কখনো ঠাট্টা সোচ্চার হয় আবেগের উচ্চারণে, পর মুহূর্তেই সুর নেমে পড়ে পদাতিক গদ্যে।

বাসের একি শিংভাঙ্গা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

চলমান দৃশ্যের বর্ণনা বিষ্ণু দে-তেও আছে, কিন্তু এ বর্ণনা নিসর্গশোভার তাৎপর্যহীন অলংকরণ মাত্র নয়—এখানে এসে যায় 'বড়বাজারের উপলউপকূলে/ জনগণের প্রবল স্রোত'-এর বর্ণনা, নাগরিক জীবন—ছেঁড়া নোংরা ভিড়, দুঃস্থ কেরাণী জীবন, 'বড়বাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশ'। একটু যেন আবেশও তৈরি হয় এই 'অমর আকাশ'-এর বর্ণনার সময়। কিন্তু মুহূর্তেই সেটা

বানচাল হয়ে যায় কেজো গন্ধের আক্রমণে। তারপর ঠাট্টার মতো আসে

হে বিরাট নদী
স্টিমারের বাঁশি
খালাসীর গান
সব পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে·· ইত্যাদি।

'অপরপক্ষ' কবিতায়ও আছে রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামের বর্ণনা, যেন কিছুটা স্নিগ্ধ কৌতুকে।

ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে।
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়া ব্রিজ, ন মিনিট বাকি।
দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে। ('অপরপক্ষ')

কিন্তু বিষ্ণু দে-বর্ণিত confusion – 'ট্র্যাফিকের এটাক্সিয়া'—যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, এটা হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা, তা থেকে হয়তো বড়-অর্থে সময়েরই বর্ণনা।

ট্র্যাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পণ্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
পিঁপড়ের সারি

গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !
পাঁচ মিনিট, পাঁচমিনিট মোটে। 
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাঁও...( 'টপ্পা-ঠুংরি' )

সব প্রতীক্ষা ও আয়োজনের অবসান নৈরাশ্যে—উভয় কবির কবিতাতেই। কিন্তু 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে মানসিক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য মূর্ত হয় কবিতার যুক্তিপরম্পরার বিপর্যয়ে, মনস্তাত্ত্বিক অসংলগ্নতায়।

দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালেব প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল···
ডাকলেম নাম.ধরে,
কী জানি ছাড়া আর কোনো কারণ নেই
যেন পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত। ( 'অপরপক্ষ' )
এল ট্রেন
মন্থিত করে রক্তের জোয়ার ··
হায়রে! আশার ছলনে ভুলি!
কোথায় তুমি! ট্রেন তো এল!
কয়লাখনি ধসে পড়ুক
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন তো এল! ( 'টপ্পা-ঠুংরি' )

'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি 'টপ্পা-ঠুংরি'-র বছরেই ( ১৯৩৫ ) লেখা। 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে যে বিচ্ছিন্নতা বা অসংলগ্নতা বা নৈরাশ্য রূপ পেয়েছিল, এ-কবিতাটি যেন তা থেকেই মুক্তির নির্দেশ। 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতাটি শেষ হয়েছিল এই আত্মকথনে :

হায় রে!
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে ?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ?

আত্মসচেতনতার এ এক ঘোর সংকট। আবেগের ব্যক্তিসর্বস্বতার নানা

ঝুঁকি। কিন্তু লিবিডোকে কি শেষ পর্যন্ত, কোনো বুর্জোয়া খেয়ালে বা ধ্রুপদী অবদমনেই শুধু চালাতে হয়? পরিত্রাণ নেই? এই লিবিডোরই, বাঁকা নয়, যেন সোজা অবাধ প্রকাশ দেখা গেল 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়। এ তো জানা কথা, ফ্রয়েড যার মধ্যে যৌনতার প্রাধান্য দেখতেন, মনোবিজ্ঞানী য়ুং সেই লিবিডো বা প্রাণাবেগকে আরো ব্যাপক পৌরাণিক ভিত্তিতে চিনেছেন। এমনকি আদিম উপজাতিরা উদ্যত বর্শা হাতে যখন ছুটে যেত ঝোপে-ঢাকা মাটির গর্তের দিকে, য়ুং-এর কাছে তাতে শুধু যৌনতারই প্রকাশ ছিল না, যৌনতাকে শস্যফলানোর আবেগে রূপান্তরিত করার মানসও থাকত।[১০]

'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় যখন পড়া যায়,

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।<br>কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?<br>নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া?<br>চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?

তখন সুধীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে একে 'রিরংসার রূপক'[১১] বলার লোভ জাগেই যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই সুধীন্দ্রনাথের ঐ শব্দ দুটোকে মন থেকে তাড়াতে পারেন না।[১২] ঘোড়সওয়ার ও চোরাবালির অবয়বগত বৈশিষ্ট্য মনে রাখলে একের জন্য অন্যের প্রতীক্ষা, প্রার্থনা বা মিলনাকাঙ্ক্ষায় হয়তো সত্যিই ওরকম অনুষঙ্গ মন থেকে তাড়ানো সহজ নয়। 'চোরাবালি' শব্দটির মধ্যে যৌন শারীরিকতার কিছু ইশারাও হয়তো ভেবে নেওয়া যেতে পারে। কবি যখন বলেন 'পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে/আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে', তখন 'চোরাবালি'-যুগের যৌন-আবেশের বিকারও উঁকি মারে যেন এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই। আবার এই কামনা তো বাসর-গড়ার মায়াকে এড়িয়ে সর্বগ্রাসী আত্মাহুতিও চায়, ললাটে সূর্যের তিলক পড়াতে চায় ঘোড়সওয়ারকে। তবে কি কামনার দুটি রূপই হানা দেয় কবিতায়?

সুধীন্দ্রনাথই অবশ্য 'রিরংসার রূপক'-এর ঐ ব্যাখ্যাকে নাকচ করে য়ুং-এর কথাও তুলেছেন।[১৩] য়ুং-এর ব্যাখ্যাতা বলেন, 'লিবিডোর স্বাভাবিক গতি হচ্ছে সামনে-পেছনে, ওঠা-পড়ায়—প্রায় ভাবা যায় যেন জোয়ারভাটা।'[১৪] জনসমুদ্রে যখন জোয়ার নামে, কবির হৃদয়ে যদি তখন ভাটার টানে চড়াই পড়ে থাকে—তবে সে-ও তো লিবিডোর গতিরই একটি দিক, অন্ধকার দিক। সামনে এগোনোর জন্য পিছু হটা। কিন্তু অন্য গতি তো শুরু হবেই, মুক্তির জন্য সামনে

এগোনো। জনসমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্নতার পর ঐক্য। কবিতার শুরু লিবিডোর পশ্চাদ্‌গতির ও বিচ্ছিন্নতার বাস্তবতায়, কিন্তু ক্রমশই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হতে থাকে। সেই পূর্ণতাই কবিতার ঈপ্সিত, যে-পূর্ণতায় জনসমুদ্রের জোয়ার কবির হৃদয়কেও উদ্বেলিত করে। সেই প্রাণাবেগ, যার ছোঁয়ায় হৃদয়ের 'আঁধির চড়া'—ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা—ঘুচে যায়।

তাই এই সর্বজনপ্রশংসিত কিন্তু বিতর্কমূলক কবিতাটি প্রসঙ্গে যে-ব্যাখ্যাই আসুক – সুধীন্দ্রনাথ-উত্থাপিত 'রিরংসার রূপক' অথবা 'প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধারোপ'[১৫]—কিংবা মার্টিন কার্কম্যানের ব্যাখ্যানুসারে বার্তাবহ বিপ্লব[১৬]—কিংবা রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধার—কোনো ব্যাখ্যাই হয়তো অসংগত নয়। এবং এরকম যে নানা ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে, তার কারণ 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির স্বাবলম্বী ও স্বাধীন প্রতীক হিসেবে সার্থকতা। প্রতীকের এই অর্থবিস্তার ও সার্বজনীনতাই বোধহয় য়ুং-এর ব্যাখ্যায় সমর্থিত।

এই কবিতার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ঘোড়সওয়ার প্রতিমাটিকে পরবর্তী রূপান্তরের আলোয় যদি দেখা যায়, তবে হয়তো বিষ্ণু দে-র কবিতার বিচারে তার প্রাসঙ্গিকতা একটু বাড়ে বই কমে না। পরবর্তীকালে এই প্রতিমায় যে অন্য সামাজিক তাৎপর্য এসে গেছে, তার কোনো সম্ভাবনাই কি ছিল না এখানেও?

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত!
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল
বলো কি তোমার ব্রত? ('বৈকালী' ২, 'পূর্বলেখ')

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া? ('ছড়া : লালতারা',
'সন্দ্বীপের চর')

সমষ্টির গুরুভারে অহল্যার স্বকীয় মর্যাদা
এনে দিক সবাইকেই বিপ্লবী লঘিমা দুর্বার
লাখো লাখো ঘোড়সওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
সফেন চঞ্চল নৃত্যে সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ?
('বহুবড়বা', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

প্রাণের ঘোড়া এখন বরকন্দাজের হুমকি অগ্রাহ্য করে জনসমুদ্রে মিশে গেছে বিপ্লব-ভাবনার দুর্বার হালকা হাওয়ায়। আগে ছিল 'চোরাবালি'-র পক্ষ থেকে আহ্বান, এবার ঘোড়সওয়ারের পুরুষকারের ব্রত উদ্‌যাপন। প্রতীকের আড়াল থেকে সামাজিক প্রতিজ্ঞাগ্রহণের স্পষ্টতায়। প্রতীকেও কি নিহিত ছিল না এই পুরুষার্থ ?

কবিতাটির অর্থ-উদ্ধারে এই আপাত দুরূহতা সত্ত্বেও ব্যাপক পাঠকসাধারণকে কোথায় যেন ভেতরে-ভেতরে ধাক্কা দেয়। হয়তো যে-কারণে কবিতাটি জনপ্রিয়, তা হল এর এই কেন্দ্রীয় পরাক্রান্ত আবেগ, যে আবেগ প্রতিটি বাক্‌প্রতিমায়, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি শব্দে সঞ্চারিত। এর ধ্বনি, শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেছেন 'একই কবিতায়...বিভিন্ন স্পন্দসঞ্চার'[১৭], বিষয়ের চাপকে পৌঁছে দেয় পাঠকের মনে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির সাক্ষ্যেই এ-কবিতাকে 'ড্রিম পোয়েমের সগোত্র' এবং 'অবচেতনের চাপে' 'অনর্গল উৎসারিত' বলে বর্ণনা করেছেন।[১৮] হয়তো 'পরিচয়'-এর প্রথম ভাষ্যটি তাই ('পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪৩ ব)। কিন্তু পরে গ্রন্থস্থ হবার সময় দেখা গেল বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।[১৯] অর্থাৎ শব্দকে অমোঘ করার এই সাফল্য কিছুটা অন্তত দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্যেই ঘটেছে। শব্দের অনিবার্য প্রয়োগে ও তাকে নিরন্তর শাণিত করার শ্রমে সমস্ত কবিতায় প্রতীক্ষার সুর এমন আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে, প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা ও আবেগে কাঁপছে শব্দগুলি, যে, কবিতাটির টেনশন বা চাপ কারোর পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়।

নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা পড়া...
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর...
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরো থরো...
কামনার টানে সংহত গ্রেসিআর...

কামনার এই আগ্রাসী আচ্ছন্নতার মধ্যে হঠাৎ পাওয়া গেল মুক্তির সন্ধান—'চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার।' তুরঙ্গ তো অসুস্থ প্রেতচ্ছায়া-কামনার চোরাগলি এড়িয়ে সুস্থ কামনার টানে বৈতরণী পার হবে। 'পরিচয়'-এর পাঠান্তরে এর ইঙ্গিত আরো জানা হয়ে যায়, যখন ঈষৎ অর্থান্তরে তিনি বলেন, 'চেয়ে দেখ দূরে অমরলোকের দ্বার।'

এই ব্যাকুল কামনা বা প্রতীক্ষার পর মিলন ঘটবে যখন, তখন বলার থাকবে শুধু : 'হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো।' লক্ষণীয় যে, সমস্ত কবিতায়

এই 'হাল্কা হাওয়া'-র সম্ভাবনা বা চাওয়াপাওয়ার কথা বলা হয়েছে বারবার।

হাল্কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো। ...

হাল্কা হাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো

পাহাড় এখানে হাল্কা হাওয়ায় বোনে...

হাল্কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে লোকনিন্দার দিন ..

লিবিডোর মুক্তি বা চরিতার্থতার পর শারীরিক টেনশন-মুক্তির সূচক এই 'হাল্কা হাওয়া'? বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে জনসংযোগের, আনন্দ বা প্রীতির সেই আকাঙ্ক্ষিত জগৎ, যার জন্য প্রাণাবেগের আকুল উচ্ছ্বাস? 'চোরাবালি'-তেই তো তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়া'? এর পর থেকে এই অনুষঙ্গে 'হাল্কা হাওয়া' তার কবিতায় আজীবন উঁকি দিয়ে গেছে।

'ওফেলিয়া' এবং 'ক্রেসিডা' দুটি কবিতার পেছনেই শেক্সপীয়রের নাটক এবং অন্যান্য বহু রচনা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে, অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি অসামান্য মৌলিক দুটি কবিতা রচনা করেছেন—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ভাষায় 'নৈবাহ্য উপকরণে এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি।'[১০] এই অর্থেই তিনি কবিতা দুটিকে বলেছেন 'সংক্ষিপ্ত সামান্যীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ'। আরো বলেছেন, গীতি-কবিতা ও নাট্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এখানে। 'ওফেলিয়া'কবিতায় শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের পুনর্বর্ণন করে কবি ব্যাপকতর সত্যের কথাই বলেছেন—'প্রেমিকসাধারণের সুদীর্ঘ জীবনকাহিনীর সারসংগ্রহ' শুধু নয়, তাদের অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডিকেও। ওফেলিয়া তাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক।' প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ট্র্যাজেডির মহিমা আরোপের জন্যই তিনি হ্যামলেটের মধ্যস্থতায় এই কথা বলেছেন এবং 'তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে শেক্সপীয়রের বিশ্বমানবিক ছায়া পড়েছে।' 'ক্রেসিডা' কবিতাতেও আছে এই নাট্যরচনার প্রচেষ্টা—তিনি এখানে 'বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী ভাবের নাটকীয় প্রতিসাম্য ঘটিয়েছেন।' কবিতা দুটি সম্পর্কে এই হল সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

সন্দেহ নেই, 'চোরাবালি'-তে প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং মোহবর্জন যে বহু সমাজব্যঙ্গমূলক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেই মনোভাব থেকেই কবিতা দুটি রচিত। অবশ্য উচ্চারণরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র

তৎকালীন কাব্যাদর্শের পরিচয়ই মেলে। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্ববীক্ষা নয়, বরং কোনো 'নৈরাত্ম্য উপকরণে'র মধ্যেই স্বকীয় অভিজ্ঞতার সমীকরণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। 'কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবনা' ('কাব্যের মুক্তি', সুধীন্দ্রনাথ)। এবং তখন এই কাব্যাদর্শের তাগিদেই মননজাত উল্লেখের ঘটা এবং সেই সূত্রে দুর্বোধ্যতাও খানিকটা অনিবার্য। ইংরেজি সাহিত্যের এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর সেকালীন উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছেন, তার কারণ 'বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্তা' এই চরিত্র দুটিই হতে পারে, দীপ্তি ত্রিপাঠীর ভাষায়, তাঁর ঐ তৎকালীন চিন্তার সার্থক 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ'।[২১]

হ্যামলেটের জবানিতেই কবিতাটি বলা। ওফেলিয়া হ্যামলেটের মন ভুলিয়েছিল, তার মনে জাগিয়েছিল উদ্ধত প্রেমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু হ্যামলেট দেখতে পায়নি মেঘের রেশমী আড়ালে বজ্রের যাওয়া-আসা—ফলে যা ঘটবার ঘটল: 'অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই।' হ্যামলেটের মোহ, প্রেম সম্পর্কে আশা এবং সম্ভাবনা বারবার জাগছে বহু প্রতিমার মধ্যে—মাঝে-মাঝেই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে বটে—কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আলোছায়ার লীলা ভেঙে যায় চূড়ান্ত বিনাশে। সমস্ত কবিতাটিকেই বলা যায় আলো-আঁধারী প্রতিমার মালা। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'ও-দুটি কবিতায় ['ক্রেসিডা'-র কথাও বলছেন] কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটাই আমার কাছে রহস্য।'[২২] এখন কিন্তু আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই আপাত বিচ্ছিন্নতা বা অসংলগ্নতা হ্যামলেটের চিত্তবিক্ষোভের সূত্রেই এসেছে। কবিতাটিতে সব সময় নাটকের কালানুক্রম বা যুক্তিবিন্যাস মানা হয় নি। হ্যামলেটের মনে আস্থা ও সন্দেহ গুচ্ছে-গুচ্ছে আসা-যাওয়া করেছে এবং তারই শব্দচিত্র ও প্রতিমা অসম্বন্ধভাবে, অন্তত আপাত অসম্বন্ধতায়, এসেছে। এটা আরো প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন দেখি 'পরিচয়'-এর পাঠে (কার্তিক ১৩৪১ ব) যে স্তবকবিন্যাস, তা এ-গ্রন্থে কিরকম ওলোটপালোট করে সাজানো হয়েছে।[২৩] সময়ক্রম এখানে বড় কথা নয়, তাকে খানিকটা ভেঙে দেওয়াই যেন উদ্দেশ্য।

শেক্সপীয়র-সমালোচক উইলসন নাইটের প্রভাবের কথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ।[২৪] ওফেলিয়া প্রসঙ্গে উইলসন নাইট বলেন, 'Flowers, music, water-life, love : all blend in Ophelia'। বস্তুত কবিতার শুরুতেই প্রথম স্তবকের নান্দীমুখে এই গান, ফুল, সংগ্রামী ও দুঃসাহসী প্রেমের প্রতিমা

আসে। কিন্তু তারপরই হ্যামলেটের পীড়িত স্নায়ু, তার বিনিদ্র অন্বেষণ, এ যুগের নায়কেরই বিচ্ছিন্নতার বোধ—'কথায় আমার গৃহহারা'—'ঝোড়ো হাওয়া' আর 'কালো কালো বুনো মেঘে'র প্রতিমা। উইলসন নাইট বলেন, 'Hamlet is a dark force in the world'। যে-কোনো জীবনরূপেই তার বিরোধিতা—তার সন্দেহের রং কালো। পুরো একটা স্তবক জুড়ে অন্ধকারেব প্রতিমা—হেডিসের মতো আঁধার—'জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা'। কিন্তু তার পাশাপাশি বৈপরীত্যে আসে নয়নের দীপশিখা, প্রেমের আলো—'বহ্নি তব দিক্ দীপশিখা'—'darkness and light are contrasted'।

কিন্তু হ্যামলেটের একাকিত্ব ঘোচে নি—সে তার প্রখর আত্মজ্ঞান নিয়ে একা।

রাত্রি রয়েছে পাশে—
তুষারশীতল কঠিনোজ্জ্বল ক্ষুরধার তরবারি।
রাত্রি ও আমি একা।

তার জীবনের সমস্ত মূল্যবোধে নাড়া খেয়েছে, অনেক বড় ব্যাপারে সে বিচলিত বিপর্যস্ত। 'শরতের শাদা খামকা-খুশির মেঘে' কি নির্বোধেব মতো খুশি হওয়া সম্ভব? আসে ওফেলিয়ার মৃত্যু—'flowery and watery death ot Ophelia'—হ্যামলেটের পরাজয় দুঃসাহসী প্রেমের পরাজয়, সংগীতের পরাজয়।

জীবনের প্রতি অবিশ্বাসে হ্যামলেট ওফেলিয়াকেও সন্দেহ করে—'আমার মন ভোলালে ওফেলিয়া'। মনে পড়ে স্বপ্নের মতো, ওফেলিয়ার প্রেম—'নীল রহস্য নয়নে' 'স্নিগ্ধ গভীর দীর্ঘ'—সে প্রেমে হ্যামলেটেরও উজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়, মনে হয় 'হ্রদ ভেঙে আবর্ত হবে মন্দাকিনী' এবং তার জলে হবে হ্যামলেটের ব্রত-উদ্‌যাপন, 'অপস্নৃদীক্ষা'। হঠাৎ প্রসার্পিনার উপমা কি প্রেমের উজ্জীবনকে শ্লথ করে দেয়—প্রেমের অধোগতির সূচনা? হ্যামলেট কি তার ভাবসাম্য হারিয়ে ফেলে?

আবার অবিশ্বাস, সন্দেহ—কিছুতেই এড়ানো যায় না ট্র্যাজেডি। মেঘেব রেশমী আড়ালে আর খুশি থাকা যায় না, তার পেছনে-পেছনেই বজ্রের সংকেত। ট্র্যাজিক আয়রনির ইঙ্গিত। ফলে সমস্ত সর্বনাশ নেমে আসে শেষের তিনটি লাইনে। 'পরিচয়'-এর পাঠে ছিল 'ট্রয়ের প্রাচীর হল চুরমার এল্‌সিনোরেই'—গ্রন্থে এটা বদলে হল বটে 'অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই'—কিন্তু ট্রয়ের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে পরাজয়ের মাত্রাকে তিনি সীমাহীন করে তুললেন। প্রেমের পরাজয়ের মধ্যেই যেন বিশ্বের পরাজয়।

'ক্রেসিডা'-য় কিন্তু কালানুক্রম, অর্থাৎ ট্রয়লাসের অভিজ্ঞতার কালানুক্রমিক বিন্যাসকে মানা হয়েছে বলেই মনে হয়। তার সবচেয়ে বড় যুক্তি হল এই যে, ঘটনার মধ্যপর্বে ক্রেসিডার বিদায়-সর্বনাশ ও অন্তিমপর্বে হেনরিসনের কল্পনাকে পর্যায়ক্রমেই অনুসরণ করা হয়েছে—যদিও যখন যেমন ভেবেছেন চসার, হেনরিসন বা শেক্সপীয়রকে তাদেব রূপায়ণের ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি ব্যবহাব করেছেন অবিরোধে।

'ক্রেসিডা' কবিতাটিও ট্রয়লাসের জবানিতে বলা। তাই ট্রয়লাসের পরিচয়-দানেই কবিতার শুরু—অনুভূতির আবেগের কল্পনার জগতের অধিবাসী সেই প্রেমিক নায়ক, যার অনুভূতি-কল্পনা-আবেগ নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং বিনিদ্র প্রতীক্ষার চাপে অস্থির। এই জাত প্রেমিক, কিন্তু প্রেমের আধার নেই বলে যার হৃদয়ে শূন্যতাব হাহাকার—ঠিক যেন নদী পার হবে বলে যাত্রী খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখছে মাঝি নেই, চোখ ঝলসে যায় তীরের ধু-ধু-করা বালিতে, কোনো আশ্রয় নেই, সান্ত্বনা নেই।

ক্রেসিডার সান্নিধ্যে এই ঝলসানো দিনে শান্তি এল। যে 'বালুকাবেলা'-র কথা এবং বালুকাবেলায় 'চোখ পুড়ে মরে দূবে'-র কথা আগের স্তবকে, অপ্রেমের যুগে, বলা হয়েছিল, আজ সেই চোখে নেমে আসে জুড়িয়ে-যাওয়া স্নিগ্ধতা। 'পুড়ে মরে'-র স্থানে 'ঝরে সান্নিধ্যের ধারা'—জলের আভাস পাওয়া গেল। শুধু দিন নয়, রাত্রিও—আবেকটু পরে যে কথা বলা হবে সেই 'সর্বসমর্পণ', ট্রয়লাসের। গ্রীষ্মের দাবদাহেব যেটুকু স্মৃতিও ছিল পরের লাইন দুটিতে (১০-১১), সবটাই মুছে গেল—'শ্রাবণের ধারাজল', 'তালীবনদীঘি', 'অবিরাম কল্লোল' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে সজলতা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। প্রেমের স্নিগ্ধ সজলতায় হৃদয় মুখর ট্রয়লাসের।

এবার প্রশ্ন অন্য দিক থেকেও। ক্রেসিডার চোখে কি দ্বিধা? একই সঙ্গে সে চোখে ভীরুতা, অথচ ট্রয়লাসের প্রতি আশ্বাস—'থমকানো চোখ' ও 'বরাভয়' শব্দ দুটির বৈপরীত্যে। এ কি প্রেমিকার স্বাভাবিক ব্রীড়া? অনভিজ্ঞা কুমারীর লজ্জা? কিন্তু ক্রেসিডা প্রসঙ্গে চসার থেকে শেক্সপীয়র সকলেই বলেছেন, অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি এই নারী। 'অনন্ত স্মৃতি' বা ঔপনিষদিক শব্দ নিজকৃতকার্যের অর্থসূচক 'ক্রতুকৃতম'—শব্দ দুটি পর পর নায়িকার এই বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে। এ হেন ক্রেসিডাকে জয় করে নেওয়ার গৌরবধ্বনি ট্রয়লাসের কণ্ঠে, স্তবকের শেষ চরণে।

এবার সর্বসমর্পিত প্রেমের যাত্রা শুরু। শুধু নদী পার হওয়া নয়, সাগর পাড়ি দেওয়ার সাহস এসে যায় প্রেমিকের। 'ভীরু-দুর্বল মন' একটি স্তবকে উচ্চারণ করেই পরের দুটি স্তবকে বেপরোয়া সাহসিকতার উল্লেখ প্রেমিকের মনকে ফুটিয়ে তোলে। সকল প্রেমিকের কাছে দৈব তো অনুকূলই—'মহাকালে'র 'দক্ষিণ কর' ছড়ানো। এই দৈবানুকূল্যের ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে ট্রয়লাস-ক্রেসিডার সব কটি ভাষ্যে—বলা হয়েছে 'ট্রয়লাসে ভাগ্যই সর্বব্যাপ্ত'।

পরের অংশেই, দু-লাইনের মধ্যে (১৯-২০), ট্রয়লাস-ক্রেসিডার এই ব্যক্তিগত প্রেমকে স্থাপন করা হল ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। এবং হেলেনের নামোচ্চারণ সেখানে অনিবার্য—কারণ তাকে নিয়ে ট্রয়েব যুদ্ধের তোলপাড। ইতিহাসের সেই ত্রিভুবনব্যাপী আলোড়নের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা তীব্র হয়ে ওঠে, তা যেন ট্রয়লাসের ব্যক্তিগত প্রেমকেও শঙ্কিত করে।

পরের একটি নিঃসঙ্গ চরণে ২১), রাবীন্দ্রিক উচ্চারণে, সেই প্রেমের সর্বনাশের সব কথা যেন বলা হয়ে যায়। 'ঝঞ্ঝার করতাল' শুধু ট্রয়েব লড়াইয়ে নয়, ট্রয়লাস-ক্রেসিডার 'বজর্নীগন্ধা-বনে'-ও 'ঝড়'। তবে কি ক্রেসিডার আকস্মিক বিদায়ের কথা জানা গেল এবার? আর তার পরিণাম? ট্র্যাজেডির হাহাকার ধ্বনিত হল এই একটিমাত্র চবণেই।

পরের তিনটি লাইনেও (২২-২৪) দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি ও ইতিহাস দুয়েরই সমান্তরাল সর্বনাশের ইঙ্গিত প্রাকৃতিক টেনশনের মধ্যে আভাসিত করার চেষ্টা। ঝড়ের ইঙ্গিত বৈশাখের আকাশে, যুদ্ধক্ষেত্রেও 'রথচক্রের ধূলি', আবার ট্রয়লাসের অনুভূতিতেও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। তাই প্রথম স্তবকে যে নায়ক বলেছিলেন 'স্বপ্ন আমার কবিতা', আজ সেই 'স্বপ্নগোধূলি'-র মায়া অদৃশ্য, তার জায়গায় প্রবল রক্তাক্ত যুদ্ধের নিয়ামক পরিণতি, স্বপ্নকে ম্লান করে দেয় 'খর রক্তের কোলাহল'।

ফলে শুধু বৃহৎ পটভূমিতেই নয়, ট্রয়লাস-ক্রেসিডার চিত্তজগতেও ঘোর বিশৃঙ্খলা। আকাশে বিভিন্ন বর্ণের মেঘ—লাল নীল ধেঁয়াটে মেঘের দ্রুত আনাগোনায় বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। শেষ পর্যন্ত কালো মেঘ আসে সর্বনাশের বার্তা নিয়ে, কল্কির মতো। বিদ্যুতে বজ্রপাতে এলোমেলো বাতাসে সেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ঘনীভূত হয়। তার মধ্যেই ক্রেসিডার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে, ভোলা যায় না, যদিও পরিবর্তন আসন্ন।

প্রেমের স্বর্ণযুগ শেষ। আবার জনহীন 'তপ্তমরু'—প্রেমের আগে যেমন ছিল 'কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলা'। তবে তখন ছিল পাশে সাহসী বন্ধু ও দার্শনিক

উপদেষ্টা প্যাণ্ডার, যে নিয়ে গিয়েছিল তাকে প্রেমের চরম প্রাপ্তিতে। কিন্তু আজ যখন ক্রেসিডা চলে যায়, তখন প্যাণ্ডারের ভূমিকা আর কোথায়? এখন শুধু ভবিষ্যতের নৈরাশ্য ও অপার ক্লান্তি। প্যাণ্ডারের সঙ্গে আগে তা নিয়ে সংযোগ চলতে পারত, কিন্তু এখন কী লাভ? ক্রেসিডাকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে তিনি ঠকলেন। আজ সেই ভ্রান্তির মানসিকতায় যদি তিনি বৈতরণীর পারে গিয়ে ওঠেনও, সেই উত্তরণ প্রেমেব নয়, সুখের নয—ক্লান্তির ও নৈরাশ্যের।

অ্যাপোলোর অবৈধ সন্তান হেলেনের জন্মের সঙ্গে বা তাঁকে নিয়ে স্বর্গমর্ত্য-ব্যাপী আলোড়নের সঙ্গে ট্রয়লাসের প্রেমের ব্যর্থতা-সাফল্যের যোগ কোথায়? কিন্তু যোগ আছে নিশ্চযই—ট্রযলাসেব জীবনে যে ফুল ফোটে, সেই শিউলি শুকিয়ে যায—তার জীবন যুক্ত হয়ে যায় ট্রযের যুদ্ধে যে মৃত্যুসাধনা চলেছে তার সঙ্গে—তান্ত্রিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বলা যায়, জবার সঙ্গে তুলনীয় ট্রয়লাসের জীবন, যা মৃত্যুর জন্য উৎসর্গীকৃত।

ক্রেসিডাকে ভোলা অসম্ভব মনে হয়েছিল—এখন দেখা যাচ্ছে 'সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে'। আর ক্রেসিডা তো এখন উজ্জীবন আনে না—তাই জীবনের তাগিদেই সেই মৃত প্রেমকে ত্যাগ করা শ্রেয। নিজেকে ছাড়িযে যে সূর্যালোক, জীবনের অঙ্কুর সেখানেই, উজ্জীবনও সেখানেই। প্রেম আজ হেলেনের মধ্যে প্রতীক লাভ করেছে, যে হেলেন শুধু সর্বনাশই ডেকে আনে, সর্বনাশ প্রেমিকের জীবনে, ট্রয়ের জীবনেও।

ভাগ্যের ওঠাপড়া এইভাবে ঘটে—প্রেমিকের ভাগ্যে প্রেমের আকুলতা আসে, আবাব 'মুখর সে গান' ভেঙে যায। কিন্তু আজ বোধহয় এই রঙ্গ ত্যাগ করে বোঝাপড়াব সময় এসেছে। 'ভূমিশায়িনী শিউলি' কি সেই প্রেমেরই পরিণতি, যা ক্ষণস্থায়ী? নাকি বিশ্বাসঘাতিনী ক্রেসিডার পরিণাম?

শত্রুশিবিরে ক্রেসিডা অন্যের কণ্ঠলগ্ন, তার শরীরে চোখেমুখে ভোগের চিহ্ন। অথচ ট্রয়লাসের মনে যে প্রেমের বীজ তা আজ বিকশিত। আসল পরাজয় তো ট্রয়লাস বা ট্রয়েরও এখানেই যে ক্রেসিডা বিশ্বাসঘাতিনী, ক্রেসিডার 'সারা শরীরে নগ্নভাষা'।

কিন্তু পরাজয়ের আত্মবিলাপে অন্তত এ কবিতা শেষ হয় নি। এরপর থেকেই ট্রয়লাস পেয়েছে অন্য উত্তরণ। সুধীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, শেক্সপীয়রী মুমূর্ষা' নয়, 'চসরী জিজীবিষা'।[২৫] তাই পর পর তিনটি স্তবকে ট্রয়লাস ফিরে পান তাঁর আত্মস্থতা—সব জাগতিক শোকের অকিঞ্চিৎকরতার ঊর্ধ্বে। নিজেকে

বর্মে ঢেকে ফেলেন, যেখানে ক্রেসিডার বর্শা ব্যর্থ হয় আঘাত হানতে—'বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্-খান্।'

পরের তিনটি স্তবকে (৮৯-৯০ লাইন) 'হেনরিসনের পদাঙ্ক' অনুসরণ করে তিনি যুদ্ধবিজয়ী ট্রয়লাসকে ফিরিয়ে আনেন। ট্রয়লাসের জয়গান চতুর্দিকে, আর কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হৃতসৌন্দর্য 'বেহিসাবী ক্রেসিডা'—নতমস্তক, দীন প্রার্থী। ট্র্যাজিক আয়রনির এ অন্য হিসেব ক্রেসিডার জীবনে।

সুতরাং সংক্ষেপেই বলা যায়, ক্রেসিডার চলে যাওয়ার কথা, মাত্র দুটি লাইনে। পরের দুটি লাইনে আবো উত্তরণের কথা—অন্য জীবনের কথা। 'কালো সন্ধ্যায়' 'শ্বেতবাহু' সেই মুক্তির নির্দেশ? 'রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী' কে জানি না। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নবোঢার বাহুবন্ধন'।[২৬] এ কি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজন? চসর, হেনরিসন বা শেক্সপীয়র কারো লেখাতেই তো অন্য নারীর উল্লেখ নেই।

তবে কি 'তুমি' (পুরনো ক্রেসিডা, ট্রয়লাসের প্রেমিকা ক্রেসিডা) এবং 'রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী' (ফিরে-আসা ভিখারিণী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপরিচিতা ক্রেসিডা) ব্যক্তি হিসেবে একই? কালো সন্ধ্যায় 'শ্বেতবাহু' কি ক্রেসিডার ঐ কুষ্ঠরোগেরই ইঙ্গিত? প্রেমের-বিশ্বাসের জগতকে ঢেকে দিল ঐ বিশ্বাসঘাতিনী, হেনরিসনের ভাষ্যে শাস্তি-পাওয়া নারীর হাত দুটি।

তারপর দীর্ঘ একটি ছেদ। ক্রেসিডা যখন সম্পূর্ণ বর্জিত, প্রাক্তন, তখনই ট্রয়লাসের কাছে সে মাঝে-মাঝে ফিরে আসে। বারবার মনে পড়ে তার অতীতের সাহচর্যের মাধুর্য। কিন্তু ফেরার উপায় নেই, তাগিদও নেই, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—শুধু ছিন্ন পড়ে থাকে বড় জোর একটি নিঃসঙ্গ লাইন:

'স্মরণে তোমার হানে আজো তরবারি!'

১/৪ অশোক সেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৬ ব।

২. রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ ব।

৩. দ্র. 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ কর্তৃক লিখিত "আর্থিক উন্নতি"-র তিন বৎসর'। বিনয়কুমার সরকার, 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান', ১ম ভাগ (১৯২৫-৩১)। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, ১৯৪০। পৃ ৫১৪-৪৬।

৫/৭/১১/১৩/১৫/২০/২৪/২৫/২৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'চোরাবালি'। 'স্বগত', ভারতীভবন, ১৩৪৫ ব। পৃ যথাক্রমে ২১৫, ২১৫, ২১৩, ২১৩, ২১৩, ২১১, ২১০, ২১১, ২১১। ২০নং অংশটি যে অনুচ্ছেদে আছে, তার সব কটি উদ্ধৃতিরই উৎস এই।

৬. বুদ্ধদেব বসু, "চোরাবালি"। 'কালের পুতুল', কবিতাভবন, ১৯৪৬। পৃ যথাক্রমে ৮৮-৯।

৮. প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরী'। বেলেভিউ পাবলিশার্স, ১৩৫৬ ব (২য় সং)। পৃ ১-৫, ১১২-১৩।

. এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন অশ্রুকুমার সিকদার ('রাবীন্দ্রিক আধুনিক'। ...বঙ্গ', মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬ ব)। কিন্তু ঐ প্রবন্ধে তিনি একটি ভ্রান্ত অনুমান জ্ঞাপন করেছেন ...ই মনে হয়। অবশ্য এই ভ্রান্তির অনেকগুলি কারণ আছে। গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুটির ...নাকাল নেই, কিন্তু 'পাত্র ও পাত্রী' নামে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। ...দিকে, বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি' 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ...র রচনাকাল 'চোরাবালি' গ্রন্থের সিগনেট সংস্করণে আছে ১৯৩৫ (ভারতীভবন-১ম সংস্করণে ...নাকাল নেই)। এ থেকে অনুমান করা অসংগত যে, প্রকাশের পূর্বে বিষ্ণু দে-র কবিতাটি পাঠ ...র রবীন্দ্রনাথ তার নিজের ভাষায় কবিতাটি পুনর্লেখন করেছেন। বরং রহস্য উদ্ধার যদি ...রতেই হয়, এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে, 'টপ্পা-ঠুংরি'-র রচনাকাল ভুলবশত ১৯৩৫ দেওয়া হয়েছে, ...বা বিষ্ণু দে-ই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা-দুটি পড়েছিলেন। দুজনের ব্যক্তিগত, ...াজিক বা সাহিত্যিক অবস্থান থেকে এই অনুমানই সংগত।

১০/১৪. Fried Fordham, *An introduction to Jung's psychology*. Penguin, ...৫০। পৃ যথাক্রমে ২১৩, ১৮। অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১২. রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', ১১শ খণ্ড। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। বিশ্বভারতী, ...৩৮১ ব। পৃ ২৬।

১৬/১৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঘোড়সওয়ার'। 'অমৃত', ১ ফাল্গুন ১৩৫৬ ব।

১৭. শঙ্খ ঘোষ, 'বক্তব্য ছন্দের দুর্গে'। 'ছন্দের বারান্দা', চিত্রক, ১৩৫৬ ব। পৃ ৮৮।

১৯/২৩. অরুণ সেন, 'বিষ্ণু দে: কবিতার পাঠান্তর'। 'পরিচয়', শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৬ ব

২১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'বিষ্ণু দে'। 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়'। নাভানা, ১৯৫৯। ...২৯৯।

# 'সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি ভাষা'

'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'-র পর, বিষ্ণু দে নিজেই ইঙ্গিতে বলেছেন, 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন ধাপ, বাঁকবদল।[১] রাজনৈতিক চেতনার প্রথম কাব্য। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ দেখেছি কবি 'ব্যক্তিচিত্রকে জগচ্চিত্র ভাবার' মোহময় জগৎ ছেড়ে কিভাবে তীর্থযাত্রীর কঠিন ও নিঃসঙ্গ নিষ্ঠায়

পৌঁছুতে চেয়েছেন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উপলব্ধির জগতে। 'চোরাবালি'-তে সেই উপার্জনেরই বহুচারী অনুশীলন। 'চোরাবালি'-র কাব্যভাষায় পরোক্ষচর্চার সাফল্য, বা সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নৈরাত্ম্য সিদ্ধি'—তার পরও সেই বিজিত রাজ্য ত্যাগ করে তিনি যে নতুন অনুসন্ধান ও উচ্চারণের ঝুঁকি নিলেন, তার পেছনের তাগিদটা এই নবলব্ধ সমাজচেতনাই। কিন্তু দেখবার বিষয় কিভাবে এই নতুন রাজনৈতিক সংলগ্নতা ও অঙ্গীকারকে প্রথমে কিছুটা তাত্ত্বিকভাবে হলেও পরে নিজের পূর্বতন ও বর্তমান অভিজ্ঞতার নানা আবেগের সঙ্গে ক্রমশ মিলিয়ে নিলেন, বা বলা যায়, কিভাবে তিনি ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ পরোক্ষকে এক বৃহৎ তাৎপর্যে মেশাতে চাইলেন, অর্থাৎ তাঁর কাব্যজীবনের যা অন্বিষ্ট তার সূত্রপাত হল—এ সবেরই জমি এই 'পূর্বলেখ'। সব কটি কবিতাতেই এই সাফল্য সমান ঘটেছে এমন নিশ্চয়ই বলা যায় না। বরং কিভাবে রাজনৈতিক সংলগ্নতার চাপের মধ্যেও তিনি ক্রমশ ব্যক্তি ও ব্যক্তিনিরপেক্ষর সমন্বয়ের কঠিন জগতে পৌঁছলেন সেই চেষ্টারই ইতিহাস এখানে।

কখনো সনেটের সংবৃত গাম্ভীর্যে ও খানিকটা স্বেচ্ছাকৃত ছককাটা বিন্যাসে, কখনো রাজনৈতিক রূপকের অতি-প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় যে সামান্য মতবাদনির্ভরতার দূরত্ব থেকে যায়, তা এ-গ্রন্থেরই কোনো কোনো কবিতায় আবার আস্তে আস্তে সরেও যায়। বহু সংগ্রামের পর যেন কবি সহজ হয়ে ওঠেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাপে নবলব্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে—বা উল্টোটাও—সামাজিক-রাজনৈতিক নতুন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগতকে চিনতে শুরু করার অভিযানে।

'সপ্তপদী' কবিতাটি এরকমই চরিতার্থতার একটি উদাহরণ। তবে সবচেয়ে সফল বোধহয় তিনি 'পদধ্বনি' ও 'জন্মাষ্টমী'-তে। ফলে কোনো-এক সমসাময়িক পুস্তক-সমালোচনার লেখকের ভাষায় প্রথম কবিতা 'বিভীষণের গান' এ-গ্রন্থে 'ফতোয়া কবিতা' হতে পারে[২]—কিন্তু ফতোয়ার উঁচুগলা খাদে নামিয়ে তিনি তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতার সঠিক উচ্চারণ খুঁজে পেলেন কিন্তু এই দুটি কবিতাতেই 'পদধ্বনি'-কে এমনকি পূর্বযুগের প্রেমের অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলে ধরে নিতে বাধা থাকে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, কোথায় যেন প্রেমের অভিজ্ঞতার জগৎ পার হয়ে অন্য এক ইঙ্গিতকে খোঁজা হচ্ছে। উলূপীর প্রেমের 'তিমির পঙ্ক' ও উর্বশীর প্রেমের 'আতিশয্যের ভার' পার হয়ে-হয়ে যখ পৌঁছনো গেল সুভদ্রার প্রেমের পরিপূর্ণতায়—'সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত

াহানায়' — চকিতে পেয়ে গেলাম যখন বিষ্ণু দে-র আসন্ন পরিণত-কাব্যজগতের ।-আবিষ্কৃত ভাষা — তখন কিন্তু পালাবদলেরও শুরু। এসে যায় 'দস্যুদল' — ভূন জগতেব নতুন শক্তি। কবিরও জন্মান্তর ঘটে। 'বিভীষণের গান'-এ-ই চ। কবি বলেছিলেন, 'স্বধর্মে আজ সন্দিহান।' কবির অন্বয় একবাব যেন ার্জুনের সঙ্গে, আরেকবার এই নতুন দস্যুদলের সঙ্গে। অর্জুনের সঙ্গে অন্বয়ের্যাজিক আয়রনি-তেই শেষ নয়, বিভীষণের মতো তাঁর শ্রেণীবদল ঘটে — স্যুদলের আবির্ভাব ঘোষণাতে তাই তাঁর কণ্ঠে এত উৎসাহ। আর তখনই সব াৎপর্য বুঝে নিতে আমাদের জরুবি হয়ে পড়ে এই রাজনৈতিক মাত্রার — নতন্ত্রের সিদ্ধির উত্তরাধিকারী, অথচ ধনতন্ত্রেব কবরের ওপরই যার আবিভাব, দই সমাজতন্ত্রের জয়গান।

'জন্মাষ্টমী'-তে এই রাজনৈতিক মাত্রা আবও সংবদ্ধ, আরো পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় নশ্চিত। অর্জুনের ক্লান্তি, গ্লানি ও পরাজয়বোধ এখানে শহুরে জীবনের অতীত রামান্টিক মায়ার উদ্গীরণে এবং বর্তমান অবক্ষয় ও খণ্ডভাব মধ্যে ছড়িয়ে যায়— প্রমের বদলে সামাজিক পটভূমির বিস্তাবকে মুখ্য বিষয় করার ফলে। আর স্যুদল বা কিরাতের আবির্ভাব নিরঙ্গ রূপ পায় বেঠোফেনের সিমফনির াংগীতিক বর্ণনায়। এও তো কবিরই অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত অগ্রগতির এই মভিজ্ঞতার ইতিহাসের সূত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে আসে বৃহৎ সামাজিক-রাজনৈতিক াট। কবির অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে বড অভিজ্ঞতারই অণুবিশ্ব—তাৎপর্য পায় াজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বৃহৎ মাত্রার আলোকে।

কবির এই অগ্রগতির সাক্ষ্য বা দিকবদলেব ঘোষণা গ্রন্থে-বিন্যস্ত প্রথম কবিতা থেকেই প্রায়। কিন্তু উপমাটা 'বিভীষণের গান' কবিতায় বড বেশি সাজাসুজি ও কিছুটা উগ্র। ধনতন্ত্রের মৃত্যুসংকট ও বিভীষণের দলবদল বা শ্রণীবদল খানিকটা যান্ত্রিক সমীকরণের কারণেও বোধহয় একটু কম অভিনব। তবু একদিকে 'অতিপুষ্টির অতিসার রোগে বর্ণহীন' এবং 'শোথাতুর' স্বর্ণলঙ্কা, মার অন্যদিকে 'প্রবল মরণে এ রোগ হানো' বা 'প্রাণপ্রবাহের সঞ্জীবনী তৃষা'— রাগ ং রোগমুক্তির এই প্রতিমার বিন্যাসে কবিতাটিতে যে সংহতি আসে, তার আকর্ষণ সন্দেহাতীত। সর্বোপরি আছে : 'মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর'— এ গ্রন্থের সবচেয়ে আদৃত প্রতিমা।

এই বাঁকবদলের কাহিনী, 'বিভীষণের গান'-এ যা ছিল রূপকের আড়ালে,

তা-ই যেন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায় স্বীকৃতি পায় এবার 'পূর্বলেখ'-র দ্বিতীয় কবিতা, অর্থাৎ 'চতুর্দশপদী' কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতায়।

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যবিহার।
ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ-শেষে।
তুষারকৈলাসে ক্ষান্ত ভ্রমণস্পৃহার
কেলাসিত অভীপ্সাও পরাক্রান্ত দেশে।
শান্ত হল কৈশোরের নিঃসঙ্গ বিচার,
বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বর মন।
যাযাবর অহংকারে আপন ইচ্ছার
নিরালম্ব সীমা পেল বিহঙ্গ যৌবন।

ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে আগের যুগের কাব্যসন্ধান বিষয়ে তীক্ষ্ণ আত্মসমালোচনা। কবির কাছে আজ সব বাতিল—নাট্যকাব্যের পরোক্ষতা, নিছক শিল্পিত প্রয়াসের শৌখিনতা ও হিমশীতল শুদ্ধতা, আত্মনির্ভর বুদ্ধি ও আবেগের উপর আস্থা, সব কিছুই। যৌবনধর্মে আত্মবিশ্বাসের অহংকার তাকে অস্থির করে তুলতেই পারে—কিন্তু তার ইচ্ছার সীমাবদ্ধতাটাও জানা হয়ে যায়, কেননা সে ইচ্ছার কোনো অবলম্বন নেই, শিকড় নেই। তাই 'ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ শেষে।'

এই আত্মসমালোচনার অষ্টকের পরেই আছে, যে-জগতকে তিনি এবার বরণ করতে চলেছেন, তার মানচিত্র, সনেটের দ্বিতীয় স্তবকের পাঁচ লাইনের পরিমিতিতে :

হে আদি জননী, আজ তীর্থযাত্রী ফিরে
তোমার সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি বাসা।
অজানা অন্নজদল আছে বটে ঘিরে,
তবুও অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা
তোমারই আননে দেখি, বিশ্বরূপ মাঝে।

'নিঃসঙ্গ বিচার'-এর পরেই 'সহস্রবাহু নীড'-এর বৈপরীত্যটা লক্ষণীয়। নিঃসঙ্গ ক্লান্ত তীর্থযাত্রী তুষারকৈলাসে ব্যর্থ ভ্রমণ সেরে ভগ্নদূতের মতো ফিরে এল নতুন আশ্রয়ে। এ আশ্রয় জনগণসঙ্ঘের মিলিত ঐক্যে—কবির কাছে অনেক কিছু অপরিচিত ঠেকে, তিনি তো অভ্যস্ত 'নিঃসঙ্গ বিচারে'-র ভুবনে—কিন্তু আজ তিনি এই সত্যে পৌঁছেছেন যে এখানেই অতীতের ক্লান্তি ও ব্যর্থতার অপনোদন,

এখানেই অতীতের যা কিছু উপার্জন তার সার্থকতা। ভবিষ্যতের আশাও এখানে। তাই এই আশ্রয়েই কবির মুক্তি। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মতো নতুন এই উপলব্ধির জগতেই তিনি দেখেন সমগ্রের রূপ। এই আশ্রয়কে যে তিনি 'আদিজননী' বলে সম্বোধন করেছেন, তাতেও কি পাই য়ুং-এর 'গ্রেট মাদার'-কে? বোঝা যায় কবি দেশের মাটির ভেতরে শিকড় চালাতে যান, দেশমাতৃকার সঙ্গে পরিচয়টা করতে চান গাঢ়।

ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর উদ্ধৃতিতে যে কবিতার শিরোনাম ('Oisive Jeunesse…'), তাতেও আছে এই আত্মসমালোচনা এবং নতুন সমাজচৈতন্যে বাঁকবদলের কাব্যসিদ্ধান্ত—তবে রূপকের পরোক্ষতায় নয়—সেই সমালোচনা ও প্রতিজ্ঞা বিস্তারিত হল এই কবিতায় খানিকটা সামাজিক পটভূমির স্পষ্টতায়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' থেকে ইন্দ্রিয়তীব্র কয়েকটি লাইন অনুবাদ করেছিলেন বিষ্ণু দে। এবার র‍্যাঁবো এসেছেন যৌবনের অনুভূতি-সর্বস্ব বদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে। 'Idle youth/enslaved by everything/by being too sensitive/I have wasted my life'—এই হচ্ছে শিরোনামটির অলিভার বার্নাড-কৃত পেঙ্গুইন সংস্করণের অনুবাদ।[৩] র‍্যাঁবো-র লাইন দুটির সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের প্রাক্তন কাব্য-অভিজ্ঞতার জগৎ যেন পার হয়ে যেতে চান। অন্যদিক থেকে আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাষ্য চাবিয়ে যেতে চায় নাগরিক মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতার বাগধারায়। কবিতাটিতে অন্তত তিনবার আছে—'অনিদ্রাজীবী', 'চোখে নিদ্রা নেই', 'অনিদ্রাঘেঁষা' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ। আহত ইন্দ্রিয়ানুভূতি একদা কবিকে বিনিদ্র করে রেখেছিল—আজ তার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা—মধ্যবিত্তের সুখস্বপ্ন বিলীয়মান, কঠিন বর্তমান তাদের নিদ্রা-টুকুকেও কেড়ে নিয়েছে। 'ধূসর দিন', 'বিরস প্রহর', 'বিবশ শহর' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে মধ্যবিত্ত ennui-এর স্বরূপটাও বোঝা যায়।

স্নায়ুর উপর আঘাত এবং বাঁকবদলের সচেতনতায় সেই সংকটকে চিনে নেওয়ার এই যে অভিজ্ঞতা, তাকে কবি চিত্রিত করেছেন 'সোনালি ঈগল' কবিতাটির প্রায় অবচেতন-মনস্তত্ত্বের জগতে। উপলব্ধির নতুন নতুন সংজ্ঞা ও ভাষার উপার্জন এবং পুরনো জমিকে ফেলে আসার মধ্যে মানসিক চাপ ও সংকট তো দেখা দেবেই। 'সোনালি ঈগল' কবিতাটিতে সেই মানসসংকট বা যুগসন্ধির চাপেরই সাক্ষ্য। স্বর্ণবর্ণ ঈগল নাকি স্কটল্যাণ্ডে একেবারে কাল্পনিক নয়। কিন্তু সেই সব 'ব্যক্তিগত' 'সোনালি স্বপ্ন'-র মরণদশা 'বেদনায় জবুথবু' জটায়ুর

মতোই। তাই সোনালি ঈগলের 'চঞ্চু' নামে আমাদের অচেতন নিশ্চিন্ততা ও সুখস্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে?

ফ্রয়েড তাঁর উদ্বেগ-স্বপ্ন বা anxiety dream-এর বিবরণে পাখির চঞ্চুর কথা বলেছেন—সেই উদ্বেগ ও তার ভীতিজনক শিহরণ কবিতার সর্বত্র ব্যাপ্ত।

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় শার্শিতে
ছাতে, দরজায়. ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

কবি স্বপ্ন দেখেন, আমাদের 'তন্দ্রাহত শহরে', 'পথে পথে দিকে দিকে' সোনালি ঈগলের নেমে-আসা—তার কল্পসৌন্দর্য নিয়ে নয়, তার আক্রমণাত্মক উদ্যত চঞ্চু নিয়ে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা থেকে শুরু করে কবির নিজস্ব সমস্যা পর্যন্ত যে অনিশ্চয়তা ও ভীতি কবিকে গ্রাস করেছে এ-সময়, তারই স্বপ্নতাড়িত বর্ণনা এই 'সোনালি ঈগল'। অবশ্য কবি তবু আত্মসমর্পণে রাজি নন—প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখেন 'স্বল্প সত্য'—'তবুও খুঁজি তোমায়'—যদিও জানেন 'ছিঁড়ে গেছে সব মিল'। পরাক্রান্ত তাঁর আশা, যদি 'স্বল্প সত্য' কোনো দিন 'সাবলীল' হয়।

এই আশা শুধু ব্যক্তিগত নয়. তিনি জানেন রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি মধ্যবিত্তেরও মুক্তি আত্মসমালোচনায় এবং আত্মপ্রসারণে। 'হে নিঃসঙ্গ শামুক!' এই হচ্ছে আত্মসম্বোধন। শুধু আত্মগত ভাবনায় বা আত্মকণ্ডূয়নে মুক্তি নেই, মুক্তি নেই নিছক অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের জগতে—সবই চোরাগলি। একমাত্র আত্মপ্রসারেই মুক্তি, স্বার্থবিসর্জনেই মুক্তি —সে প্রসার ভৌগোলিক সামাজিক রাজনৈতিক সব অর্থেই।

হে নিঃসঙ্গ শামুক! তোমার কুটিল মন!
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন। (Oisive Jeunesse)

বিষ্ণু দে-র প্রথম যুগের সৎ আত্মজিজ্ঞাসার নিশ্চয় এটাই পরিণতি। প্রথম যুগের কাব্যজিজ্ঞাসায় এলিঅট ও পাউণ্ডের নির্দেশিত আধুনিকতা তাঁকে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছিল ব্যক্তিময়তা বা ব্যক্তিসর্বস্বতার ঊর্ধ্বে উঠতে এবং

ঐতিহ্যসন্ধানের গুরুত্ব বুঝে নিতে। কিন্তু ঐতিহ্যের স্বরূপ বা সমগ্রতা যে এলিঅটের পথনির্দেশে পাওয়া যাবে না, সেই উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছলেন অচিরে এবং সে ব্যাপারে তাঁর প্রধান অবলম্বন হল মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা।

এই সমগ্রতার ধারণায় পৌঁছতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ যেমন দায়ী, তেমনি তার পশ্চাদপটে সক্রিয় ছিল নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নতুন ঘটনা বা পুরনো ঘটনারই রূপান্তর। ধনতান্ত্রিক বিশ্বের আর্থিক সংকটের ঘনিয়ে-ওঠা কালো ছায়া ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক দেশকে যে কতখানি বিচলিত করবে তা তো সহজেই অনুমেয়। তার চেয়েও বড় কথা, 'পূর্বলেখ'-র কবিকে এই বিশ্বসংকটের পরিণতি, বিশেষত ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিস্তারের দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—ঠিক যেমন তাঁর আশাবাদের পেছনে কাজ করে-ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পিত উন্নতি ও দেশে-দেশে সাম্যবাদী দলের সংহতির দৃষ্টান্ত। মনের এই দরজা খুলে যাওয়ার ব্যাপারটাকে কবি নিজেই তাঁর আত্মপরিচয়মূলক রচনায় বর্ণনা করেছেন এই ভাবে (অবশ্য ইতিহাসটা আরো আগে থেকে শুরু করে): 'আর তখন এদিকে চলেছে রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ী কীর্তিযাত্রা আর তাকে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ পরিগ্রহণের আবহাওয়া। আর গান্ধিজীর আন্দোলনগুলি দেশকে থেকে থেকে দোলা দিচ্ছে আর থেকে থেকে প্রত্যাহার প্রায়শ্চিত্ত চলছে, চোখের সামনে শ্বেত রাজকীয় লোভের মরিচা প্রতাপের মধ্যে। তারপরে তো এসে পড়ল চীন-জাপানের লড়াই, স্পেনে এল সভ্যতার বীরত্ব ও প্রতিক্রিয়ার জোটের কাছে শেষ পর্যন্ত লজ্জাকর হার, এল মুসোলিনি হিটলারের ফ্যাসিজম্। পৃথিবী হয়ে উঠতে লাগল অসমতার মধ্যেও মনে মনে একটি দুনিয়া।'[৪] এই হল স্বদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় পৌঁছনোর পটভূমি।

'ঘরকে বাহির' করার এই নতুন চেতনা তাঁর কাব্যের অভিজ্ঞতাতেও পৌঁছয় —আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত বা স্বদেশগত সংকটকে আরো অর্থবহতায় গ্রথিত করে কিংবা তাঁর আশাকে আরো গাঢ় করে তোলে। ব্যক্তিগত খোঁজার মনস্তাত্ত্বিক চেহারাটা যেন মুক্তি পায় রাজনৈতিক পথ সন্ধানের ব্যাপ্তিতে। ধরা যাক '১৯৩৭—স্পেন' কবিতাটিই: ফ্যাসিবাদের চক্রান্তের 'জীবনজয়ী' সাফল্যে—'প্রণয়' যখন পালায় 'প্রচণ্ড ভ্রূ-র ভঙ্গে' এবং 'রুচির হাসির শুচিতা' মুছে যায় 'অঘোরপন্থী'-র 'রক্তে'—তখন সেই প্রবাদবিখ্যাত ক্ষ্যাপা শুধু খুঁজে ফেরে স্পর্শমণি। এই 'স্পর্শমণি-'ই 'স্বল্পসত্য'। স্পেনকে রক্ষা

করার প্রতিজ্ঞায় 'আন্তর্জাতিক বাহিনী' সেই স্পর্শমণিরই খোঁজ পায়, স্বল্প সত্য হয়ে ওঠে সাবলীল—'বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি'। কিন্তু অন্য দিকে প্রাণ-বাঁচানোর তাগিদে অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে, ভেঙে দিতে চায় ঐ 'স্বল্প সত্যে'-র বনিয়াদ। ফ্রাঙ্কোকে মদত দিয়ে চলে প্রত্যক্ষভাবে হিটলারের জর্মানি, মুসোলিনির ইতালি, পরোক্ষভাবে 'মিত্রশক্তি' ব্রিটেন ও আমেরিকা। 'শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু মিত্র।'

মার্কসবাদী এই চেতনাই তাঁকে নিয়ে যায় 'ঘর ও বাহির আপন ও পর' এই পুঁথিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে। এই চেতনাতেই আবার তিনি নতুন পরিস্থিতিতে শিল্পীর দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হলেন। ধনতন্ত্রের সংকট ও ফ্যাসিবাদের উত্থান সারা পৃথিবীর শিল্পীসাহিত্যিকদেরই চিন্তাকুল ও সংহত করেছিল এ-সময়ে। একেই বলা হয়েছে, 'বিশ্বপ্রগতির কর্ম ও চেতনার বিস্তারে শিল্পীর নবজন্ম।' প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্মের সময়ও এটাই। ভারতবর্ষে এবং সেই সূত্রে বাংলা দেশেও ঐ আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল—১৯৩৬-এ ভারতে প্রগতি লেখক সংঘের জন্মও হল। বলা বাহুল্য, বিষ্ণু দে সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় : [ বিষ্ণু দে-র সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের ] 'অনতিবিলম্বে চিন্তায় খানিকটা সাযুজ্য আবিষ্কৃত হল, সভাসমিতি ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত হলেও, "প্রগতি" আন্দোলনকে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করলেও বিরূপতা দেখালেন না, বরঞ্চ নিজের ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে সহায়তাই করলেন আরম্ভ হল অন্তরঙ্গ সহযোগিতা যা আজও অটুট।'[৫] এই হচ্ছে 'পূর্বলেখ'-যুগের কথা।

'হেগেলের আত্মশ্লাঘা'র বৈপরীত্যে তাঁর ঐতিহ্যচেতনায় আসে 'মাতিসের আলপনা'—কেননা এরই সঙ্গে তো সংলগ্ন জনজীবন, কারখানা ও চাষের মানুষ। তাই এই নতুন চেতনাতে সমৃদ্ধ হযেই তিনি করতে পারেন মৃত্তিকাসংলগ্নতার ঘোষণা, জীবনের সরলতা প্রার্থনা করতে পারেন 'গ্রাম্য রাখাল', সমাজ-পরিবর্তনের ধাক্কায় যে আজ 'রেল লাইনের কুলি', তার কাছে।

দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের,
সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
ঋজু বনস্পতি হোক মৃত্তিকায় ঘনিষ্ঠ আকাশে
সমাহিত। ( 'রসায়ন' )

'পূর্বলেখ'-তে মৃত্তিকাঘনিষ্ঠতাব একটা বড বহির্লক্ষণ ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল পুরাণের ব্যবহার। পুবাণের ব্যাপক ব্যবহার তো আমরা আগেব গ্রন্থ দুটিতেও দেখেছি—কিন্তু সেখানে সমধিক এসেছে প্রতীচ্য পুরাণ। বস্তুত 'চোরাবালি'-তে প্রতীচ্য পুরাণের উল্লেখ সংখ্যায় বোধহয কিছু বেশি। 'পূর্বলেখ'-তে এসে প্রতীচ্য পুরাণের সংখ্যা দুটিতে দাঁড়িয়েছে ( য়ুলিসিস, হেক্টর ), তা'ও ব্যঙ্গেব প্রয়োজনে। পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণের উল্লেখ সংখ্যাতীত—উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ থেকে চরিত্র, প্রসঙ্গ, শব্দ এত এসেছে যে 'পূর্বলেখ'-র কবিতা-গুলির আবহ বা পবিপার্শ্বকেই প্রায ভিন্ন রকমের করে তুলেছে। ঋগ্বেদের শ্লোক উদ্ধাব করে পিতৃপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে 'পূবলেখ' গ্রন্থটি উৎসর্গের মধ্যেই বিষ্ণু দে-র সে-যুগের প্রবণতা স্পষ্ট হযেছিল। ঈশ উপনিষদের 'হিরন্ময় পাত্রেণ' শ্লোকটির শব্দগত অনুষঙ্গ 'পূর্বলেখ'-তেই ব্যবহৃত হল প্রথম। রবীন্দ্রনাথের সূত্রে উপনিষদের শব্দগত পরিচয আগেই ছিল বাঙালি পাঠকেব। বিষ্ণু দে এই সব ঔপনিষদিক অনুষঙ্গকে নবলব্ধ সমাজচেতনায় বিধৃত করে দিলেন। পরে আজীবন তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে যারা চকিত শব্দদ্যোতনায়, তাদের ব্যবহার 'পূর্বলেখ'-তেই প্রথম ( 'হিরন্ময় ঢাকা', 'সূযপাবন', 'হিবন্ময হে আদিত্য', 'হে পূষণ' ইত্যাদি )। মহাভারত থেকে দেবদেবী বা অন্যান্য চরিত্র গ্রন্থে পরিকীর্ণ হয়ে আছে।

একই সঙ্গে যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন তখনই দেশের প্রাচীন ও জীবন্ত ঐতিহ্য থেকে এই পরিগ্রহণ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মার্কসবাদকে কোন সৃজনশীলতার স্বরূপে তিনি পেতে চান। প্রতীচ্য

পুরাণের ব্যবহারের সঙ্গে আরেকটা তফাৎ লক্ষণীয় ভারতীয় পৌরাণিক উল্লেখ কিন্তু বৈপরীত্যে তেমন ব্যবহৃত হয় নি, অনুকূল উপমান বা অনুষঙ্গে কবি তাদের কালোপযোগী করে তুলেছেন। এবং আরো বিস্ময়কর এই কারণে যে, এই কাল-বোধ ধনতান্ত্রিক সমাজের আশু অর্থনৈতিক সংকট ও মুক্তি-অভীপ্সার প্রায় রাজনৈতিক ইডিয়মের সঙ্গে জড়িত। মহাকাব্যের বা পুরাণের ধ্রুপদী ন্যায়-অন্যায় বা জয়-পরাজয়ের বোধ এবং সেই জগতের চরিত্রের তৎকালীন আদর্শনির্ভর আচার-আচরণকে আধুনিক প্রতীক-ধারণার বা কবির যুগচেতনার সীমার মধ্যে এনে ফেলেছেন অনায়াসে। আর তার ফলে দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, 'বারণাবত' ইত্যাদির স্থানমাহাত্ম্য আমাদের বাস্তব জগতের ভূগোলের সঙ্গে মিলেমিশে যায়—বিভীষণ, হিরণ্যকশিপু, সুভদ্রা, ইন্দ্র, প্রহ্লাদ, সঞ্জয়, বিশ্বামিত্র, নচিকেতা ('নাচিকেত ঋণ', 'নাচিকেত মেঘ') ইত্যাদি পৌরাণিক যুগের চরিত্র আমাদেরই চেনা মানুষের ও অভিজ্ঞতার উপমান হয়ে ওঠে।

'পূর্বলেখ'-র বাঁকবদলে বিষ্ণু দে-র কবিতার সামাজিক জগতটাও প্রসারিত হয়ে গেল। 'চোরাবালি' পর্যন্ত যে জগৎ ছিল তাঁর অত্যন্ত চেনা কিন্তু সংকীর্ণ, অর্থাৎ কলকাতার উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, শিক্ষিত কালচারবিলাসী মানুষের ড্রইংরুম—সেই 'লিলি-রমা-অলকা'-র ভিড, 'সুরেশ ও সুবর্ণর অশ্লীল নিশ্বাস'-কে অতিক্রম করে চলে এল কলকাতার ও তার শহরতলির কিংবা মফস্বলের ছেঁড়াখোড়া বাস্তবতা, দরিদ্র দুস্থ পঙ্গু মানুষ, আবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ফেরেপবাজ, দালাল আর শয়তানরাও। ব্যঙ্গের জগৎ ছেড়ে কবি চলে এলেন সমব্যথীর জগতে। নতুন নতুন চরিত্র এল তাঁর কবিতার নতুন নাট্যে—ধূর্ত নাগরিক যারা অর্থকামস্বর্গ খুঁজে ফেরে হাইকোর্টের পাড়ায়, 'ডালহুসির দিকে' স্বর্ণসন্ধানী তালবাজ; ফারপোর সামনের ভিড; আত্মহারা কর্মবীর কেরানী যারা চৌরিঙ্গির পথে ছত্রভঙ্গ, গোষ্ঠ হতে ধেনুর মতোই; 'লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী' যারা সিনেমা-দোকান-কাফেতে ঘোরে, হাওড়ার দিকে পণ্টুন ব্রিজকে কাঁপিয়ে যারা ছুটছে দলে দলে সেই সাধারণ মানুষ, 'সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ', দুর্ভিক্ষে উজাড় গাঁ থেকে আসা নিরন্ন মানুষ; 'গ্রাম্য রাখাল, রেল লাইনের কুলি'—এই সব চরিত্র।

বিলাসী মধ্যবিত্তের কূপমণ্ডুক জগৎ ছেড়ে তিনি চলে এলেন বটে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের জগতে, সমব্যথীর অনুকম্পায়, কিন্তু তাঁর বাস্তবচেতনা

এই নতুন চরিত্রের চিন্তা ও অস্তিত্বের নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলাকে আঁকতে ভুল করে নি। এই জগাখিচুড়ি বাঙালি মনের কীর্তির চিত্র আমরা অনেক পেয়েছি সমসাময়িক বিবরণে। এই বাঙালি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্নে উত্তরণের নীল পাখি আর পরিণামচিন্তাবিহীন লোভের ও শক্তিমত্ততার বাজ বা এমনকি সোনালি ঈগল সব গোলমাল করে দেয়—তাই সে মানুষ 'সামান্য' এবং 'বিহ্বল'।